দাম : বারো টাকা

মেঘে ঢাকা তারা
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

ভারতের আর্থিক অবস্থা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত
পৃঃ ২৪

৭২ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ৪ নভেম্বর ২০১৯।। ১৭ কার্তিক - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

সাভারকরকে 'ভারতরত্ন' দেবার প্রস্তাবে এত বিরোধিতা কেন?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ১৭ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৪ নভেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সাভারকর ভারতের বীর সন্তান : গান্ধীজী
□ জে নন্দকুমার □ ৬

বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেই বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে □ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১০

মেঘে ঢাকা তারা □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

সাভারকর-বিরোধিতা কংগ্রেসের পরম্পরাগত ঐতিহ্য
□ সুজিত রায় □ ১৪

সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেসি সমালোচনা : প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা □ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ১৭

সায়ন্তন জীবন □ শেখর সেনগুপ্ত □ ২৩

ভারতের আর্থিক অবস্থা ও বিশেষজ্ঞদের মত
□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ২৪

ত্রিপুরার প্রতি মুজিবকন্যার অনুভূতি ন্যায়সঙ্গত □ ২৬

বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক ভাইফোঁটা □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

বউবাজার নৃত্য ভবনের ঐতিহ্যপূর্ণ জগদ্ধাত্রী পুজো
□ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৩৩

গল্প : রামলখনের ঘর ওয়াপসি □ পার্থসারথি গুহ □ ৩৫

গল্প : পরিতৃপ্তি □ বারিদবরণ বিশ্বাস □ ৩৭

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগিনী নিবেদিতা
□ সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৮

জাতি-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে পরিকল্পিত পথে □ বিশ্বামিত্র □ ৪৩

অর্থনীতির মোড় ঘোরানোই নির্বাচনী ফলাফলের সতর্কীকরণ
□ শৌভিক চক্রবর্তী □ ৪৪

রাজ্যের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
□ বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □
সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □
চিত্রকথা : ৪২ □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৮৯** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ১১ নভেম্বর ২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ নভেম্বর ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মুখোশের আড়ালে

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক চরিত্রের মুখ মুখোশে ঢাকা। বাম ও কংগ্রেসি ঐতিহাসিকেরা এইসব মুখোশ তাদের উপহার দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, প্রকৃত মুখটি আড়াল করা। ফলত, সিরাজদৌল্লার ভাগ্যবিপর্যয় নিয়ে আমাদের কান্নাকাটির অন্ত থাকে না। তিতুমিরকে নিয়ে উৎপল দত্তের নাটক দেখে আমরা উল্লসিত হই। টিপু সুলতানকে 'টাইগার অব মাইশোর' উপাধি দেওয়া হলে আমাদের মনে হয়, ঠিকই তো! কিন্তু স্বস্তিকার একটি দায়বদ্ধতা থেকে যায় এদের মুখোশ সরিয়ে প্রকৃত মুখটি দেখার। আগামী সংখ্যায় থাকবে এই বিষয়ে তিনটি রচনা। লিখবেন বিনয়ভূষণ দাশ, পারুল সিংহ এবং অভিমন্যু গুহ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাভারকরের মূল্যায়ন হউক

বিনায়ক দামোদর সাভারকর হইতেছেন সেই বিরল অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী—যাঁহার প্রকৃত মূল্যায়ন অদ্যাবধি ভারতবর্ষে হয় নাই। উপরন্তু, ব্রিটিশ শাসন আমলে অকথ্য অত্যাচারের শিকার এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে, স্বাধীন ভারতবর্ষেও সরকারের রোষে পড়িতে হইয়াছে। কতিপয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ঘৃণ্য কুৎসার শিকার হইতে হইয়াছে। প্রথমাবধি কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা সাভারকর সম্পর্কে নানাবিধ কুৎসা রটাইয়া আসিতেছে। তাঁহার চরিত্র হনন করিয়া চলিয়াছে। এমনকী, সাভারকরকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতেও তাহারা দ্বিধা করে নাই। এই ক্রমাগত মিথ্যা এবং কুৎসা প্রচারের ফলে বহু মানুষের মনেই সাভারকর সম্পর্কে একপ্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, সাভারকরের প্রকৃত মূল্যায়নের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কংগ্রেসি এবং বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী একশ্রেণীর ঐতিহাসিকের বিকৃত ব্যাখ্যা। অথচ, স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের সক্রিয় ভূমিকাটি যদি একবার পর্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী ধারার সাভারকর ছিলেন অগ্রগণ্য নেতা। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পুণেতে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গঠন করেন। পরে লন্ডনে গিয়া শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সংস্পর্শে আসিয়া সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। লন্ডনে মদনলাল ধিংড়ার হাতে ক্যাপ্টেন উইলির হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে সাভারকরের সহযোগিতা ছিল বলিয়া জানা যায়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লন্ডনেই সাভারকরকে আটক করা হয়। বিচারের উদ্দেশ্যে যখন তাঁহাকে জাহাজে মুম্বাই পাঠানো হইতেছিল, তখন সাভারকর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হন। মুম্বাইয়ের আদালতে তাহাকে পঞ্চাশ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আন্দামানে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয় তাঁহাকে। আন্দামানের সেলুলার জেলে অকথ্য অত্যাচারে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়েন তিনি। চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের পর কৌশল অবলম্বন করিয়া মুক্তি পান সাভারকর।

কারান্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকিলেও গোপনে বিপ্লব প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছিলেন সাভারকর। সাভারকর বুঝিয়াছিলেন সমগ্র জীবন কারান্তরালে কাটাইলে স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি আর সহায়তা করিতে পারিবেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত রাখিবার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসনকে রীতিমতো মূর্খ বানাইয়া শর্তসাপেক্ষে কারাগারের বাহিরে আসেন তিনি। পরে রাসবিহারী বসুর অনুরোধে সাভারকরেরই পরিকল্পনা মাফিক সুভাষচন্দ্র বসু আত্মগোপন করিয়া জার্মানি ও জাপান যান এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা সাভারকরের এই রাজনৈতিক কৌশলটির অপব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছে বরাবর। অথচ সাভারকরের প্রকৃত জীবনীটি যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, তাহা চলচ্চিত্রের মতোই রোমাঞ্চকর।

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস শাসন আমলেও সাভারকরকে কম নির্যাতনের মুখামুখি হইতে হয় নাই। গান্ধী হত্যায় তিনি জড়িত, এই মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে আটক করে কংগ্রেস সরকার। আদালতে তিনি বেকসুর সাব্যস্ত হন। সাভারকরই হইতেছেন একমাত্র বিপ্লবী—প্রতিহিংসা বশত যাহার পরিবারিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল সরকার। তবু স্থিতধী, নিজ লক্ষ্যে অবিচল এই বিপ্লবী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা এবং জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের মতোই লড়াই করিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসি এবং বামপন্থীরা সাভারকরের মতো বহু বিপ্লবীর প্রকৃত পর্যালোচনা করে নাই। বরং, বিস্মৃতির অন্ধকারে এই বিপ্লবীদের ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া অবিলম্বে এই অকুতোভয় বিপ্লবীদের যথার্থ মূল্যায়ন করা হউক— এই দাবি তুলিবার সময় এখন আসিয়াছে।

সুভাষিতম্

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্বানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্।।

বলবানের কাছে ভার কোথায়? ব্যবসায়ীদের কাছে দূর কোথায়? বিদ্বানের বিদেশ কোথায়? প্রিয়ভাষীর কাছে পর কোথায়?

সাভারকর ভারতের বীর সন্তান : গান্ধীজী

জে. নন্দকুমার

ইতিহাস খুব কম মানুষকেই বিপজ্জনক আখ্যা দেয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন সেই বিরলতম শ্রেণীর প্রতিনিধি যাকে ইতিহাস একইসঙ্গে বীর এবং বিপজ্জনক আখ্যায় ভূষিত করেছে। সাভারকর তাঁর নিজের সময়ে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার বহু নেতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। নেতাদের মধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্টদের আদিপুরুষ এম এন রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এস এ ডাঙ্গে প্রমুখও ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর নব্য কমিউনিস্টরা পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল করে সাভারকরের ভাবমূর্তি ধ্বংস করেন। এবং সাভারকরকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'বিশ্বাসঘাতক এবং ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন।

আজ একথা সবাই জানেন, সাভারকরের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হলো, তিনি আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকার সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় এই নিয়ে প্রথম বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সে সময়, জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী শক্তির পায়ের নীচের জমি শক্ত হচ্ছিল। কোণঠাসা বামপন্থীরা সেই কারণে সাভারকরকে সফ্‌ট টার্গেট বানিয়ে ফেললেন এবং তিনিই হিন্দুত্ব নামক বিষবৃক্ষের গোড়া বলে প্রচার শুরু করলেন। যার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল 'নিত্যনতুন তথ্যানুসন্ধানের'। সাভারকরের জীবনের প্রকৃত সত্য ও তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা পালটে ফেলার জন্য তৈরি হলো কৃত্রিম ইতিহাস।

শুনতে খুবই আশ্চর্য লাগবে, ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রথম যুগের নেতারা এম এন রায়, ই এস এম নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ— যারা সাভারকরের সমসাময়িক ছিলেন— তাঁরা তাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। হিন্দুত্বের প্রতি এইসব কমিউনিস্ট নেতার চিরাচরিত বিরূপ মনোভাব তাদের শ্রদ্ধার পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কমিউনিস্টরা তাঁদের রাজনৈতিক বাবুদের তৈরি করে দেওয়া নকশা অনুযায়ী সাভারকরকে জনমানসে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নানারকম মনগড়া তত্ত্ব সাজিয়ে খিচুড়ি ইতিহাস রচনা করার কাজে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছিলেন।

সাভারকর সম্পর্কিত নব্য-বাম প্রোপাগান্ডা এবং সাভারকরের জীবন ও জীবনকালের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সত্য ঘটনাবলী নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব গ্রন্থ মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, নব্য-বাম লেখকদের উত্থাপিত সাভারকর-সম্পর্কিত 'নতুন' তথ্যাবলী কি সত্যিই নতুন? যদি সত্যিই নতুন হয় তাহলে আমাদের আর একটি প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হবে। সাভারকরের সমসময়িক বাম নেতারা কেন এসব কথা বললেন না? ওদের কাছে সাভারকর ছিলেন অকুতোভয় দেশপ্রেমিক, প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং অসমসাহসী এক যোদ্ধা।

জরুরি অবস্থার সময় নব্য বামেরা ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ লোপাট করে তাদের মিথ্যে প্রোপাগান্ডাকে প্রমাণ করার জন্য গান্ধীজীকে সাভারকরের কট্টর সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া সাভারকরের তথাকথিত মুচলেকা ছিল সেইসময় একটি রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশল অবলম্বন করার জন্যই পরবর্তীকালে সাভারকর তার বৈপ্লবিক কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। বামেদের অভিযোগ, সাভারকরের মুচলেকা দেবার কথা তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কেউ জানতেন না। এবং এভাবে মুচলেকা দিয়ে কারামুক্তির আবেদন করা ছিল সে সময় চূড়ান্ত ব্যতিক্রমী। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর লেখা পত্রে এর বিপরীত তথ্য মেলে।

সাভারকরকে কট্টর গান্ধীবিরোধী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেও, গান্ধীজী সাভারকর সম্বন্ধে কী ভাবতেন বা কী লিখেছেন— সে ব্যাপারে বাম লেখকেরা কখনও আলোকপাত করেননি। যদিও আদি

যুগের ভারতীয় কমিউনিস্ট এম. এন. রায়, নাম্বুদ্রিপাদ, ডাঙ্গে প্রমুখের সাভারকর-সম্পর্কিত মতামত এবং লেখালেখি প্রকাশিত হবার পর নব্য-বাম প্রোপাগান্ডা ইতিমধ্যেই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে আশ্রয় নিয়েছে। তবুও, গান্ধীজীর এযাবৎ চেপে রাখা রচনা থেকে আমরা সাভারকর সম্পর্কে ওঁর ধারণা আরও স্পষ্টভাবে পেতে পারি।

সাভারকরের আত্মজীবনী এবং আত্মজীবনীমূলক লেখা থেকে বোঝা যায় তাঁর জীবন ছিল দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত এবং বীরত্বব্যঞ্জক। এ এমন এক জীবন যার গভীরতা মাপার সাহস কমিউনিস্টদের হবে না। এমন একটি জীবন যাপন করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। সাভারকরের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সামগ্রিক ভাবে ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি উৎসর্গীকৃত। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রশ্নে সমমনস্ক না হলেও গান্ধীজী সাভারকর ভাইদের (বিনায়ক দামোদর ও গণেশ দামোদর সাভারকর) সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। এই সম্পর্ক ছিল অন্যরকম। আপাতদৃষ্টিতে জটিল, তবে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। শত খণ্ডে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধী রচনাসমগ্রে এই তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যাবে।

দেশে দীর্ঘদিন কংগ্রেসি শাসন বহাল থাকার রাজনৈতিক লাভ ঘরে তোলার জন্য বাম ঐতিহাসিকেরা বীর সাভারকরের দেশপ্রেমিক ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস শুরু করেন। এ কাজে তারা হাতিয়ার করেন সাভারকরের তথাকথিত মুচলেকা দেবার ঘটনাটিকে। এ ব্যাপারে গান্ধীজীর ব্যাখ্যা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। গান্ধীজী লিখেছেন, সেই সময় সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুচলেকা দিয়ে কারামুক্তির সুযোগ দেওয়া হলেও সাভারকর ভাইদের দেওয়া হয়নি। গান্ধীজীর এই বক্তব্য প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে মাইলফলক স্বরূপ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সাভারকর বিরূপ মনোভাবাপন্ন হলেও, তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝে নেওয়া দরকার।

'ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ধন্যবাদ। কারণ এখন যারা রাজনৈতিক কারণে কারান্তরালে দিনাতিপাত করছেন তাদের প্রায় সকলকে মুচলেকা প্রদান করে কারামুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন বিখ্যাত রাজনৈতিক বন্দি এখনও মুক্তি পাননি। তাদের মধ্যে আমি সাভারকর ভাইদের কথা বিশেষ করে বলতে চাই। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, পঞ্জাবে যেসব রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি পেয়েছেন তাদের সঙ্গে সাভারকর ভাইদের কোনও পার্থক্য নেই। অথচ সরকারি ঘোষণার পর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হলেও সাভারকর ভাইয়েরা এখনও মুক্তি পাননি।' গান্ধীজীর 'সাভারকর ব্রাদার্স' শিরোনামাঙ্কিত একটি প্রবন্ধে রয়েছে এসব কথা। প্রবন্ধটি ২৬.৫.১৯২০ তারিখে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (দি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী; খণ্ড ২০. ৩৬৮ পৃ.)

শর্তসাপেক্ষে শাস্তি রদ করার জন্য আবেদন করা সে সময় রাজনৈতিক বন্দিদের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপার বলে বিবেচিত হতো। গান্ধীজীর রচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি সাভারকর ভাইদের

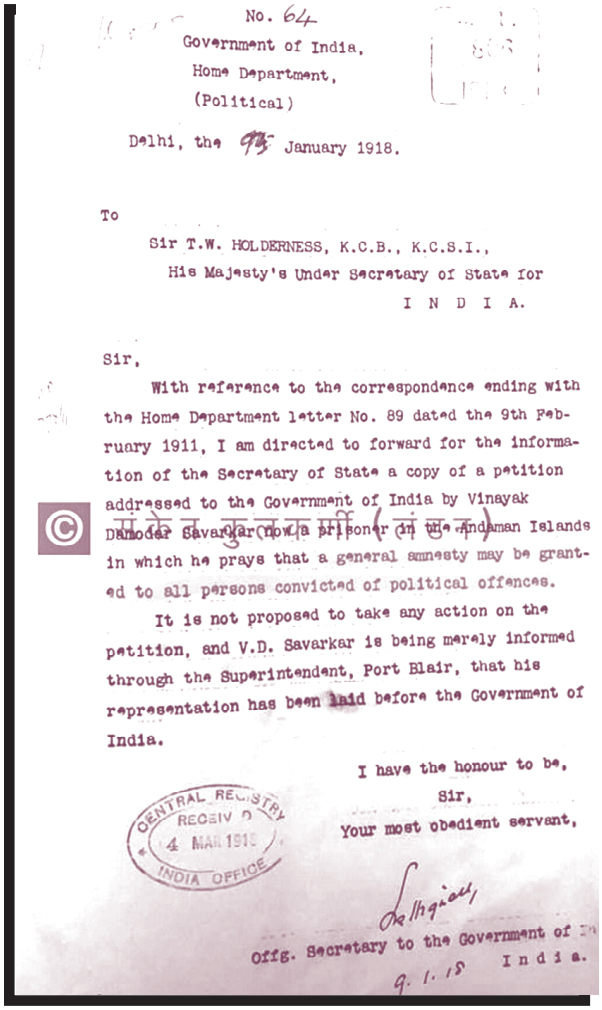

No. 64
Government of India,
Home Department,
(Political)

Delhi, the 9th January 1918.

To

Sir T.W. HOLDERNESS, K.C.B., K.C.S.I.,
His Majesty's Under Secretary of State for
I N D I A.

Sir,

With reference to the correspondence ending with the Home Department letter No. 89 dated the 9th February 1911, I am directed to forward for the information of the Secretary of State a copy of a petition addressed to the Government of India by Vinayak Damodar Savarkar now a prisoner in the Andaman Islands in which he prays that a general amnesty may be granted to all persons convicted of political offences.

It is not proposed to take any action on the petition, and V.D. Savarkar is being merely informed through the Superintendent, Port Blair, that his representation has been laid before the Government of India.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

CENTRAL REGISTRY RECEIVED 4 MAR 1918 INDIA OFFICE

Offg. Secretary to the Government of India.

9. 1. 18

লন্ডনের আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত সাভারকরের ক্ষমাভিক্ষা সম্পর্কিত নথি-১। (সৌজন্যে : টুইটার)

শাস্তি রদ করার আবেদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। আগেই বলেছি, সে সময় এই ঘটনা ছিল বহুল প্রচলিত এবং সব রাজনৈতিক বন্দি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বার্থে সাভারকর ভাইয়েরাও শাস্তি রদের আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে নব্য-বামেরা এই ঘটনাকে ক্ষমার অযোগ্য এবং 'অভূতপূর্ব' বলে চিহ্নিত করে।

উল্লেখিত প্রবন্ধটিতে গান্ধীজী গণেশ দামোদর সাভারকরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'শ্রীগণেশ দামোদর সাভারকর ভাইদের মধ্যে বড়ো। ওর জন্ম ১৮৭৯ সালে। অতি সাধারণ মানের শিক্ষা লাভ করার পর তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯০৮ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিকে সংঘটিত স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বদেশি করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ৯.৬.১৯০৯ তারিখে ১২১, ১২১ক, ১২৪ক এবং ১৫৩ক ধারায় গণেশ দামোদর সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি ঘোষিত হয়। এখনও তিনি আন্দামানেই আছেন। এগারো বছর ধরে শাস্তিভোগ করছেন। আইনের ১২১ ধারা খুবই বিখ্যাত। পঞ্জাবের বন্দিদের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ থাকলে এই ধারা প্রয়োগ করা হয়। সর্বনিম্ন শাস্তি সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ থাকলে ১২৪ক ধারা প্রয়োগ করা হয়। মৌখিক ভাবে বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখালেখির মাধ্যমে (বা অন্য কোনও ভাবে) সাধারণ মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার অভিযোগ থাকলে ১৫৩ক ধারা প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট, যেসব অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেগুলির প্রকৃতি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দেশকল্যাণমূলক। তিনি কোনও অন্যায় করেননি। গণেশ দামোদর সাভারকর বিবাহিত। তাঁর দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। যদিও আজ আর তারা কেউ ইহজগতে নেই। তাঁর স্ত্রীও আঠারো মাস আগে পরলোকগমন করেছেন।'

গণেশ দামোদর সাভারকর সম্বন্ধে বলার পর গান্ধীজী বীর সাভারকর সম্বন্ধেও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গণেশ দামোদর সাভারকরের ছোটো ভাইয়ের (বীর সাভারকর) জন্ম ১৮৮৪ সালে। তিনি পড়াশোনা করেছেন লন্ডনে। পুলিশি হেফাজত থেকে তাঁর পালানোর প্রয়াস এবং ফ্রান্সের উপকূলবর্তী সমুদ্র সাঁতরে পার হবার প্রয়াসের কারণে সাধারণ মানুষ এখনও তাকে স্মরণ করে। পুনের ফার্গুসন কলেজ থেকে পাশ করে বিনায়ক দামোদর সাভারকর লন্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টার হন। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত মহাসংগ্রামের প্রথম বিধিবদ্ধ ইতিহাস রচনা তাঁর অনন্য কীর্তি। ১৯১০ সালে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ওই বছরেরই ২৪ ডিসেম্বর গণেশ দামোদর সাভারকরের মতো তাঁকেও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া হয়। পরে, ১৯১১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় হত্যার অভিযোগ। যদিও সেই অভিযোগ ব্রিটিশ পুলিশ আদালতে প্রমাণ করতে পারেনি। বিনায়ক দামোদর সাভারকর বিবাহিত। ১৯০৯ সালে একটি পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও জীবিত রয়েছেন।'

গান্ধীজী আরও লিখেছেন, 'সাভারকর ভাইয়েরা তাঁদের রাজনৈতিক মতামত খোলাখুলি ব্যক্ত করেছেন। জানিয়েছেন, তাঁরা কোনওরকম হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং যদি তাদের শাস্তি রদ করা হয় তাহলে তারা ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ মেনে চলবেন। তাঁরা মনে করেন কোনও মানুষের পূর্ণ সংস্কার হলে তার পক্ষে দেশের আইন মেনে জীবনযাপন করা কঠিন নয়। এমনকী দেশের আইন দেশের প্রতি রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করাও সম্ভব।' শাস্তি মকুব করার আবেদনপত্রে সাভারকর ভাইয়েরা ঠিক কী কারণ দেখিয়েছিলেন, গান্ধীজীর চিঠিতে সে কথা জানার পর বামেদের মিথ্যাচার সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে। বাম লেখকেরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সাভারকর ভাইয়েরা কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে রেহাই পান। কিন্তু গান্ধীজীর চিঠিতে দেখা যাচ্ছে শাস্তি মকুবের আবেদন পত্রে সাভারকর ভাইয়েরা কী লিখেছেন সে সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি সাভারকর ভাইদের ভারতের বিশ্বস্ত এবং বীর সন্তান বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বিবেচনায় সাভারকর ভাইয়েরা, বিশেষ করে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন সুচতুর এবং বুদ্ধিমান। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার দেশব্যাপী রাজনৈতিক বন্দিদের যে সুবিধা প্রদান করেছিল, সাভারকর ভাইয়েরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র।

গান্ধীজী লিখেছেন, 'উপরন্তু আমার মনে হয়, চরমপন্থী রাজনীতিতে মানুষের আস্থা এই মুহূর্তে ঠিক ততটা নেই। ওদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভাইসরয়কে শর্তসাপেক্ষে সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেবার নির্দেশ দিয়েছে। এই অবস্থায় সাভারকর ভাইদের আটকে রাখা হলে তা সাধারণ ভারতীয়দের উষ্মার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাতে সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াও অসম্ভব নয়।'

'যেহেতু সাভারকর ভাইয়েরা ইতিমধ্যেই দীর্ঘসময় জেলে কাটিয়েছে', ওদের স্বাস্থ্য দৃষ্টিকটুভাবে ভেঙে পড়েছে— সুতরাং পুরো বিষয়টি অন্যভাবে দেখা দরকার। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, তাও ওরা ব্যক্ত করেছেন। এরপরও যদি ওদের মুক্তি দেওয়া না হয় তা হলে তা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ফলত ভাইসরয় ওদের মুক্তি দিতে বাধ্য। বিষয়টা ভাইসরয়ের এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে। বিচারক যেমন তার নিজস্ব এক্তিয়ার বলে দুই ভাইকে শাস্তি দিয়েছিলেন ভাইসরয় তার নিজের এক্তিয়ারবলে তাদের মুক্তি দিতে পারেন। ভাইসরয় যদি তা না করতে চান তাহলে তাকে জানাতে হবে কেন তিনি সাভারকর ভাইদের মুক্তি দিতে অপারগ।'

গান্ধীজী লিখেছেন, 'সাভারকর ভাইদের মামলাটি পঞ্জাবের ভাই পরমানন্দের মামলার থেকে ভালোও নয় খারাপও নয়। এ ব্যাপারে আমি পঞ্জাব সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। কারণ সরকারের জন্যই ভাই পরমানন্দ দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন। আবার ভাই পরমানন্দ নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করে শাস্তি লাঘবের আবেদন করেছেন, তার জন্য সাভারকর ভাইদের মামলাটিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজনও এখানে নেই। কারণ একবার কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে সরকারের চোখে সব ব্যক্তিই সমান। এবং গণমুক্তির সুযোগ শুধু সন্দেহজনক বন্দিদের জন্য নয়, সব বন্দিদের জন্যেই। শর্ত এটাই হওয়া উচিত সব বন্দি যেন রাজনৈতিক বন্দি হন। এবং ভাইসরয় যা বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়ে আমিও বলতে চাই, এই ঢালাও বন্দি মুক্তি যেন মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে না দাঁড়ায়। একথা অনস্বীকার্য, সাভারকর ভাইয়েরা রাজনৈতিক অপরাধী। ওদের মুক্তি দিলে গণনিরাপত্তা বিঘ্নিত হবারও কোনও আশঙ্কা নেই। ভাইসরিগ্যাল কাউন্সিলে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়েছে, সাভারকর ভাইদের মুক্তির বিষয়টি কাউন্সিলের বিবেচনাধীন। অথচ বম্বে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে সাভারকর পরিবারকে জানানো হয়েছে এ ব্যাপারে তারা কিছু জানেন না।

'ওদিকে ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সে মি. মন্টেগুও বিবৃতি দিয়েছেন, ভারত সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী না কি সাভারকর ভাইদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়! এই বিষয়টিকে এত সহজে ঝেড়ে ফেলা যাবে

না। সরকারের সার্বিক বন্দিমুক্তির ঘোষণার পরেও কোন যুক্তিতে সাভারকর ভাইদের কারান্তরালে রাখা হচ্ছে, সে কথা জানতে চাওয়ার অধিকার ভারতের মানুষের আছে।' ব্রিটিশ সরকারের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে প্রবন্ধ শেষ করেছেন গান্ধীজী।

গান্ধীজীর রচনাসমগ্রের ২৩ তম খণ্ডে (পৃ. ১৫৬) আমরা আরও একটা রচনা পেয়েছি, যার শিরোনাম হরনিম্যান (বি. জি. হরনিম্যান। বম্বে ক্রনিক্যালের সম্পাদক। ভারতবন্ধু ভূমিকার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে এবং শাস্তি স্বরূপ ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়-- স্ব. স.) অ্যান্ড কোম্পানি। লেখাটি শুরু হয়েছে গান্ধীজীর ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্য দিয়ে। তিনি স্বীকার করেছেন, সাভারকর ভাইদের নিয়ে বিশেষ কিছু না লেখার জন্য অনেকেই তাকে দোষারোপ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এসেছে বি.জি. হরনিম্যানের প্রসঙ্গটি। গান্ধীজী লিখেছেন, 'মি. হরনিম্যান সম্বন্ধে আমার উদাসীনতার জন্য বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কেউ কেউ আবার জানতে চায়, সাভারকর ভাইদের নিয়ে কেন আমি নিয়মিত লিখি না?

'আমি যদি হরনিম্যানের কথা উল্লেখ করি, কিংবা সাভারকর ভাইদের কথা— তাহলে তা অবশ্যই সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য করব না। বরং, অসহযোগ আন্দোলনকে আরও উজ্জীবিত করার জন্যই করব। মি. হরনিম্যান আগে যেমন ছিলেন— একজন সক্রিয় এবং সাহসী কমরেড— ঠিক সেভাবেই যদি ফিরে আসেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। আমি জানি তাকে অন্যায় ভাবে দেশ থেকে তাড়ানো হয়েছিল।

'সাভারকর ভাইদের প্রসঙ্গে বলি, ওদের প্রতিভা দেশের কল্যাণে কাজে লাগানো উচিত। দেশ যদি জেগে না ওঠে তাহলে আমরা খুব শীঘ্র দেশের দুই চিরবিশ্বস্ত সন্তানকে হারিয়ে ফেলব। ওদের এক ভাইকে (বিনায়ক দামোদর সাভারকর) আমি খুব ভালো ভাবেই চিনি। লন্ডনে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। উনি সাহসী, বুদ্ধিমান এবং দেশপ্রেমিক। এক কথায়, উনি একজন বিপ্লবী। ব্রিটিশ শাসনের কদর্য দিকগুলি সম্বন্ধে উনি আমার অনেক আগেই অবহিত হয়েছিলেন। দেশের সরকার যদি সদাচারী হতো তাহলে তিনি দেশের পক্ষে কল্যাণকর কোনও কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন। ওঁর এবং ওঁর বড়োভাইয়ের কথা ভাবলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।'

সাভারকর সম্বন্ধে গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ইতিহাসে এক 'নতুন আবিষ্কার' হিসেবে গণ্য হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ চেপে দেওয়ার এক ঘৃণ্য প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। বস্তুত, বিগত কয়েক দশক ধরে বাম লেখকেরা সাভারকর সম্বন্ধে যে কুৎসা এবং অপপ্রচার রটিয়ে চলেছেন গান্ধীজীর উল্লেখিত প্রবন্ধটি তার সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এবং মিথ্যা প্রমাণ করতে সক্ষম। কমিউনিস্টদের কাছে ইতিহাস নিজেদের মতাদর্শের পক্ষে সুবিধাজনক গালগল্প তৈরি করার যন্ত্রই শুধু নয়, মানুষকে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যন্ত্রও বটে। সেই কারণে আমাদের আগামী দিনগুলো টালমাটাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা আমরা যত আমাদের স্বাধীনতা সেনানীদের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হব ততই ভেঙে পড়বে বাম লেখকদের গড়া একটার পর একটা অচলায়তন।

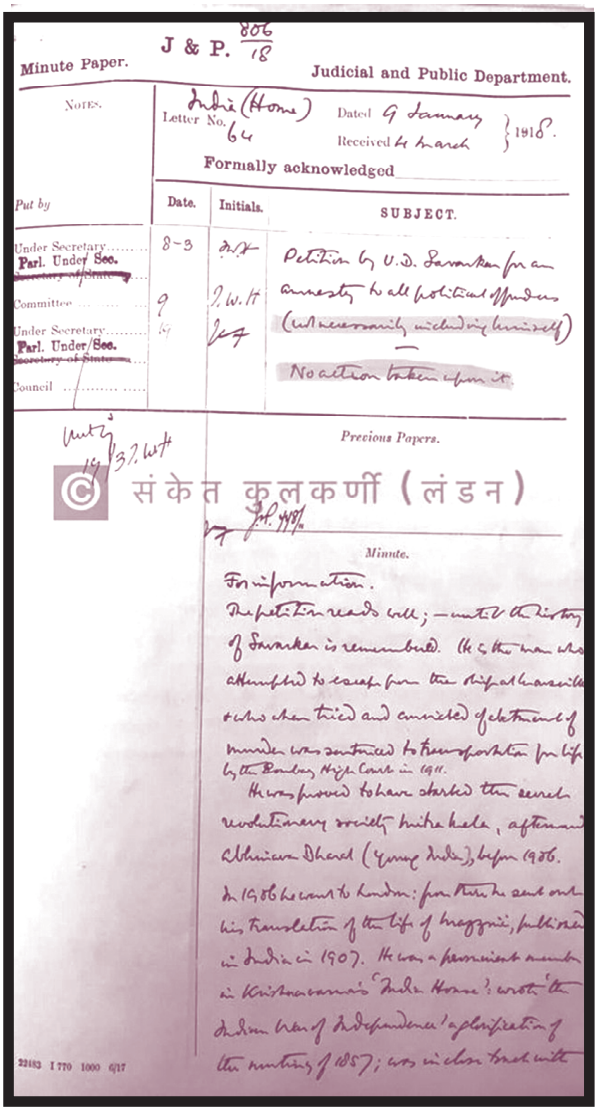

Minute Paper. J & P. 806/18 Judicial and Public Department.

Notes. Letter No. India (Home) 64 Dated 9 January, Received 4 March } 1918.

Formally acknowledged

Put by	Date.	Initials.	SUBJECT.
Under Secretary / Parl. Under Sec. / Secretary of State	8-3		Petition by V.D. Savarkar for an amnesty to all political offenders (not necessarily including himself)
Committee	9	J.W.H.	
Under Secretary / Parl. Under Sec. / Secretary of State			No action taken upon it.
Council			

Previous Papers.

© संकेत कुलकर्णी (लंडन)

Minute.

For information.

The petition reads well; — until the history of Savarkar is remembered. He is the man who attempted to escape from the ship at Marseilles & who when tried and convicted of abetment of murder was sentenced to transportation for life by the Bombay High Court in 1911.

He was proved to have started the secret revolutionary society Mitra Mela, afterwards Abhinava Bharat (Young India), before 1906.

In 1906 he went to London: from there he sent out his translation of the Life of Mazzini, published in India in 1907. He was a prominent member in Krishnavarma's 'India House': wrote the 'Indian War of Independence' a glorification of the mutiny of 1857; was in close touch with

22183 I 770 1000 6/17

লন্ডনের আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত সাভারকরের ক্ষমাভিক্ষা সম্পর্কিত নথি-২। (সৌজন্যে : টুইটার)

সময়ের এই জটিল সঙ্গমে এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে বাম লেখকদের জমি আরও উর্বর হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, দশকের পর দশক ধরে এরা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমন্বয়ের ধারণাটিকে দুর্বল করার চেষ্টা করে চলেছে। গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মবর্ষে আশা করব দেশের ঐতিহাসিক ও গবেষকেরা এ বিষয়ে সচেতন হবেন। এবং গান্ধীজী এবং সাভারকরের উষ্ণ সম্পর্কে আলোকপাত করে সাধারণ মানুষের ভ্রম সংশোধনে উদ্যোগী হবেন। গান্ধীজী এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন হিন্দ স্বরাজের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এরা ঠিক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের মূল্যায়ন করেছেন তা জানা আজ একান্ত প্রয়োজন।

(লেখক প্রজ্ঞা প্রবাহের জাতীয় আহ্বায়ক)

(সৌজন্য : অর্গানাইজার)

বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেই বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ আমাদের বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। যাতে আছে আমাদের বিচারব্যবস্থার কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপরামর্শ।

শ্রী গগৈ জানিয়েছেন, আমাদের দেশের বিভিন্ন আদালতে মামলার পাহাড় জমে রয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ গতিতে বেড়ে চলেছে বকেয়া মামলার সংখ্যা। তাঁর হিসেবে শুধু সুপ্রিম কোর্টেই বকেয়া মামলা আছে ৪৮,৬৬৩ টা, আর বিভিন্ন হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতও একই ভাবে অমীমাংসিত মামলায় ভারাক্রান্ত। তিনি আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন কোর্টে হাজার খানেক মামলা জমে আছে ৫০ বছর ধরে, আর ২৫ বছরের পুরনো মামলার সংখ্যা অন্তত ২ লাখ।

সুতরাং বলা চলে--- আমাদের বিচার-ব্যবস্থা প্রায় ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ অনেক। কিন্তু তাঁর মতে, এর প্রধান কারণ হলো বিচারকের অভাব, প্রায় সব আদালতই এই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে। প্রধানত প্রয়োজনের তুলনায় বিচারকের সংখ্যা অনেক কম হওয়ার ফলে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অগণিত বিচারপ্রার্থীকে।

এই কারণে তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন—

(১) সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা অবিলম্বে বাড়ানো হোক;

(২) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল বৃদ্ধি করে অবসরের বয়স করা হোক ৬৫; এবং

(৩) উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত কিছু বিচারপতিকে সাময়িক কালের জন্য পুনর্নিযুক্ত করা হোক।

তাঁর মতে, এতে বকেয়া মামলাগুলোর যেমন দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে, তেমনি নতুন মামলার বিচারের কাজও করা যাবে যথাসময়ে।

আমরা মনে করি, প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারের উচিত এই সব নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রথমত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি করা দরকার। অবশ্য আগে ১৯৮৮ এবং ২০০৯ সালে সংখ্যাটা বাড়িয়ে করা হয়েছিল যথাক্রমে ২৮৬ ও ৩১। এটা অবশ্যই জরুরি ছিল এবং পদক্ষেপটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মূল

আমরা আইনের শাসনের কথা বলি। কিন্তু এই অব্যবস্থা চিরদিন চলতে পারে না। একটা সহজ, সুলভ ও গতিসম্পন্ন বিচারব্যবস্থা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। তা না হলে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা প্রহসনে পরিণত হবে।

সংবিধানে সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৮। কিন্তু শ্রী গগৈ সঙ্গত কারণে মন্তব্য করেছেন--- যেভাবে মামলার সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান ব্যবস্থাটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা না বাড়ালে বর্তমানের ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে, হাইকোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সও বৃদ্ধি করা দরকার। মূল সংবিধানে সেটা ছিল ৬০। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে সেটা করা হয়েছিল ৬২।

তবে শ্রী গগৈ মনে করেন, এখন উচিত সেটা ৬৫ করা। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সের মতো। তাতেও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির সমস্যাটা কিছু লাঘব হবে।

তৃতীয়ত, তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন— সংবিধানের ১২৮ ও ২২৪ নং অনুচ্ছেদ প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কিছু বিচারপতিকে সাময়িক কালের জন্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা রেখেছে। তাঁর মতে, সেই সুযোগটা এই সঙ্কটকালে কাজে লাগানো দরকার। এইভাবে কিছু প্রবীণ বিচারপতিকে সাময়িক ভাবে টেনে আনা গেলে বকেয়া মামলার মীমাংসা করা সহজ হবে। তাঁর মতে, এটা পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রস্তাবের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

আমাদের মনে হয়--- যদি তার পরামর্শমতো বিভিন্ন আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে, তাহলে আর বকেয়া মামলার পাহাড় জমে উঠবে না।

পঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জি.ডি. খোস্‌লা মন্তব্য

করেছিলেন, The slow movement of cases results in the accumulation of arrears which causes further delay, producing a snow-balling effect।' অর্থাৎ মামলার শ্লথগতিতে সেগুলো জমে যায়, আর ইতিমধ্যেই নতুন মামলাগুলো এসে সমস্যাটাকে বাড়িয়ে তোলে। আমাদের 'ল-কমিশন' জানিয়েছে যে, বছরে যে মামলাগুলো ওঠে, তার মাত্র ৩৭ শতাংশ মীমাংসিত হয়,বাকিগুলো থেকে যায়, আর তার মধ্যেই নিত্যনতুন মামলা চলে আসে। এভাবেই বকেয়া মামলার পাহাড় জমে বিভিন্ন আদালতে। এতে অগণিত মানুষের হয়রানি, দুর্ভোগ, উদ্বেগ ও অর্থদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হয়। টেনিসনের 'দ্য ব্রুক' কবিতায় আছে— নদী বলছে— 'man may come and man may go but I go on forever।' তেমনি বিচারক বদলি হন, উকিল অবসর নেন, ফরিয়াদি মারা যান, কিন্তু অনেক সময় মামলা চলতে থাকে। এই কারণে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি.এল. ভগবতী একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'Our judicial system is crashing under the weight of arrears।'

অবশ্যই বিচারকের সংখ্যার অপ্রতুলতাই এর একক কারণ নয়। আসলে আমাদের বিচার ব্যবস্থাটাই সেকেলে, ব্রিটিশ পদ্ধতিটার কোনও সংশোধন বা আধুনিকীকরণ হয়নি। তার মন্থর গতিকে দ্রুতগামী করার কোনও চেষ্টা করা হয়নি এতদিন।

তাছাড়া পদ্ধতিটা এমনিতেই কিছুটা মন্থর হওয়ার কথা। বিচারপতি দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনেন, দলিলপত্র পরীক্ষা করেন, সাক্ষীদের বয়ান পর্যালোচনা করেন এবং তারপর ধীরে-সুস্থে রায় ঘোষণা করেন। সুতরাং কিছু সময় এই কাজে লেগে যাবেই। কিন্তু যদি বিচার প্রক্রিয়া অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক শ্লথগতিসম্পন্ন হয়, তাহলে অগণিত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। কথায় বলে— 'Justice delayed is justice denied.।'

আরও বলা দরকার--- আমাদের বিচার-ব্যবস্থাটা কেন্দ্রীভূত ও অখণ্ড— তার শীর্ষে আছে সুপ্রিম কোর্ট। সুতরাং অনেক মামলা নিম্ন আদালত থেকে ধাপে ধাপে ওঠে। কিন্তু তার প্রত্যেক স্তরেই রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা, গতিমন্থরতা ও অর্থদণ্ড। পি. এন. ভগবতী মন্তব্য করেছেন, 'the liytigants have to pass through the labyrinth of one court to another until their patience gets exhausted।' এই কারণে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মুখ গুঁজে অন্যায়-অবিচার সহ্য করেন, কিন্তু কোর্টে যান না। কারণ প্রবাদ বলে— 'going to court is to sell the cow for a hen।'

অথচ বিচারবিভাগের প্রাথমিক কাজই হলো প্রত্যেকের জন্যে সহজে, সুলভে ও দ্রুত গতিতে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা ধরনের বিপদ দেখা দেয়। বিশেষ করে এই দেশে জনসংখ্যার স্ফীতি, সামাজিক জটিলতা, সম্পর্কের সঙ্কট, অধিকার- সচেতনতা ইত্যাদি কারণে দ্বন্দ্ব-বিবাদ বেড়ে চলেছে। তার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করাই আদালতের প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু ব্যয়বাহুল্য, শ্লথগতি, জটিলতা যদি বিচার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়, তাহলে বহু মানুষের জমে থাকা ক্ষোভ ও ক্রোধ রক্তাক্ত হানাহানিতে পরিণত হতে বাধ্য। এই কারণেই দরকার একটা সুষ্ঠু বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা।

আমরা আইনের শাসনের কথা বলি। কিন্তু এই অব্যবস্থা চিরদিন চলতে পারে না। একটা সহজ, সুলভ ও গতিসম্পন্ন বিচারব্যবস্থা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। তা না হলে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা প্রহসনে পরিণত হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পি. বি. মুখার্জি মন্তব্য করেছেন, 'the language of law and the procedures of the courts must not be so exclusive, as to prevent access of common man।'

সুতরাং বিচারব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতেই হবে— নিতে হবে বিভিন্ন ব্যবস্থা। তবে শুরু করা হোক বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি দিয়ে। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মেঘে ঢাকা তারা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বিনায়ক দামোদর সাভারকর। তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিজের জীবনটিকে উৎসর্গ করেছিলেন। ব্রিটিশ কারাগারে অসংখ্য নির্যাতনের চিহ্ন ধারণ করেছিলেন নিজ শরীরে। কংগ্রেসের পাঁচতারা, সাততারা নেতারা যখন ব্রিটিশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার রাজনীতিতে ব্যস্ত থেকেছেন, এবং মাঝে মাঝে ব্রিটিশেরই অতিথেয়তায় কারাগারের অভ্যন্তরে নিরুপদ্রবে দিন কয়েক সাহিত্য রচনায় ব্যাপ্ত থেকেছেন, তখন বিনায়ক দামোদর সাভারকরই সেই ব্যক্তি--- যিনি আন্দামনের কারান্তরালে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। সাভারকর হচ্ছেন সেই বিপ্লবী— যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও, কংগ্রেস আমলে, সরকারের রোষানলে পড়েছেন। সারা জীবন কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদের বোঝা বহা এক ভাস্বর, মহান, উপেক্ষিত বীরই হচ্ছেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। এও স্বীকার করতেই হবে, এদেশের নেহরুপন্থী ও বামপন্থী ঐতিহাসিকদের রচিত স্বাধীনতার ইতিহাসে সাভারকর উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। শুধু উপেক্ষিতই নয়, মিথ্যা বিকৃতিতে তাঁর চরিত্রকে ম্লান করার চেষ্টা চলেছে। ফলত, দেশের এক গরিষ্ঠাংশ মানুষের কাছে সাভারকরের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়ইনি। সাভারকর মানুষটি কেমন, স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাটি ঠিক কেমন ছিল— এরকম বহু তথ্যই তাদের কাছে অজানা থেকে গিয়েছে। আর এর সুযোগ নিয়েছে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহল, নিজের স্বার্থে ভারতকে বিকিয়ে দেওয়া একটি রাজনৈতিক প্রভাবশালী পরিবার। সুভাষচন্দ্র বসুকে 'তোজোর কুকুর' আখ্যা দেওয়া বামপন্থীরা যেমন সাভারকর সম্পর্কে কুৎসা রটনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন, দেখাচ্ছেনও— তেমনই আজাদ হিন্দ ফৌজের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আছে যে পরিবারের বিরুদ্ধে, তাদের বর্তমান বংশধরেরা নিজেদের পূর্বপুরুষের অন্যায়কে আড়াল করতে এখনো সাভারকরকে দেশবাসীর সামনে এক বিশ্বাসঘাতকের রূপ দিতে চাইছেন। অবশ্য, এই কীর্তিমান পরিবারটির বর্তমান প্রজন্মের মতো এত স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি বোধকরি এর আগে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলংকৃত করেননি। সে যাক। কিন্তু সাভারকরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বর্ষিত হওয়া এই ঘৃণা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত জবাব একমাত্র হতে পারে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য পর্বগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা। বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় আন্দোলনের পর্বটি নিখুঁত পর্যালোচনা করা। তাতে এটুকু অন্তত পরিষ্কার হবে, স্বাধীন ভারতে দুধ ও মাখনে পরিপুষ্ট নেহরুপন্থী এবং বামপন্থীরা সাভারকর সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, প্রকৃত তথ্য কিন্তু তা বলে না। বরং, প্রকৃত তথ্য এই নেহরুপন্থী এবং বামপন্থীদের দেশের মানুষ মিথ্যাবাদী, কুৎসা রচনাকারী হিসাবেই চিহ্নিত করে।

সাভারকরের জীবনের কিছু অংশ খুব সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরা যাক। ১৮৮৩ সালের ২৪ মে মহারাষ্ট্রের ভাগুরে জন্ম বিনায়ক দামোদর সাভারকরের। তিন ভাইয়ের মধ্যে সাভারকর ছিলেন দ্বিতীয়। এখানে উল্লেখ্য, সাভারকরের প্রত্যেক ভাই-ই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় জড়িত ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই সাভারকরের মেধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি পড়াশোনা করতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন বিষয়েই তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল গভীর। তুখোড় স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সাভারকর ১৯০১ সলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর নাসিক থেকে পুনে চলে আসেন। সময়টা ১৯০২। পুনের ফার্গুসন কলেজে ভর্তি হন তিনি। এই ফার্গুসন কলেজে পড়ার সময়ই সাভারকর বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফার্গুসন কলেজে পড়ার সময়ই ১৯০৪ সালে 'মিত্র মেলা' নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন সাভারকর এবং দুশো যুবককে সংগঠিত করে একটি সভাও ডাকেন। পরে অবশ্য এই মিত্র মেলার নাম বদলে দেন অভিনব ভারত। ১৯০৬ সালে এই অভিনব ভারতের নেতৃত্ব তাঁর তিন বিপ্লবী সহকর্মী হেমচন্দ্র দাস, মির্জা আব্বাস এবং বাপটের হাতে সমর্পণ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন সাভারকর। ইংল্যান্ডে পদার্পণ করে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার। অবশ্য আলাপ হওয়া বলাটা ভুল হবে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার দেওয়া বৃত্তির অর্থেই সাভারকর বিদেশে গিয়েছিলেন। বিলেতে কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সাভারকরের চাক্ষুষ পরিচয় হয়। কৃষ্ণবর্মা ইউরোপ প্রবাসী ধনী ভারতীয়দের থেকে চাঁদা তুলে কয়েকজন ভারতীয় যুবককে পাশ্চাত্যে নিয়ে যান। সাভারকর ছিলেন তাদের ভিতর

একজন। কৃষ্ণবর্মার উদ্দেশ্য ছিল, এই ভারতীয় যুবকদের বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশীদার করা। এই কাজে কৃষ্ণবর্মাকে সাহায্য করতেন শ্রীধর রঞ্জিত রানা নামে এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। কৃষ্ণবর্মা এই ভারতীয় যুবকদের নিয়ে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন করেছিলেন। এই গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিরই সদস্য ছিলেন মদনলাল ধিংড়া। লন্ডনে কার্জন উইলিকে হত্যা করেছিলেন ধিংড়া। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডনে ইন্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ইন্ডিয়ান সোশ্যিওলজিস্ট নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি ছিল বিলেতে আশ্রয় নিয়ে গুপ্ত সংগঠন চালিয়ে যাওয়া ভারতীয়দের মিলন কেন্দ্র। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্যারিসে গিয়ে বোমা তৈরির প্রণালী শিখতে সাহায্য করেছিলেন হেমচন্দ্র কানুগোকে। দুর্ভাগ্য যে, নেহরুপন্থী ও বামপন্থী ঐতিহাসিকরা স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার ভূমিকারও যথাযথ পর্যালোচনা করেননি। বরং কৃষ্ণবর্মাও অনেকখানিই উপেক্ষিত থেকে গেছেন।

বিলেতে সরাসরি কৃষ্ণবর্মার সংস্পর্শে এসে সাভারকর সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অংশীদার হয়ে উঠলেন। ১৯০৯ সালে মদনলাল ধিংড়া যে কার্জন ইউলিকে গুলি করে হত্যা করেন, শোনা যায়, সেই বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় সাভারকরও জড়িত ছিলেন। লন্ডনে অবস্থানকালে এরকমই আরও নানাবিধ বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় সাভারকরের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। কোনো কোনো সাভারকর গবেষক এমনও তথ্য দিয়েছেন যে, এই লন্ডনে অবস্থানকালেই সাভারকরের সঙ্গে রুশ বিপ্লবের জনক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের বৈঠক হয়। তবে, এই একান্ত বৈঠকে দুজনের ভিতর কী আলোচনা হয়েছিল, সে তথ্য অবশ্য তারা দিতে পারেননি। কিন্তু এটা সহজেই অনুমান করা যায় লেনিনের সঙ্গে সাভারকরের সেই আলোচনায় ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা উঠে এসেছিল। কারণ, লেনিনও সেই সময় রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথাই চিন্তা করছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অপরাধে সাভারকরকে ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং বন্দি অবস্থাতেই বিচারের জন্য জাহাজে করে মুম্বই ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সমুদ্রপথে ফরাসি উপকূলের কাছে জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে উত্তাল সমুদ্র সাঁতরে পালাবার চেষ্টা করেন সাভারকর। তাতে অবশ্য তিনি সফল হননি। তাকে বন্দি করে ব্রিটিশ সেনা। পরে মুম্বাইয়ে বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে তাকে পঞ্চাশ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাভারকরকে প্রথমে পাঠানো হয় আন্দামানে। দীর্ঘদিন সেখানে থাকার পর তাঁকে রত্নগিরি জেলে পাঠানো হয়। চোদ্দ বছর কারাবাসের পর ভগ্নস্বাস্থ্য সাভারকর ১৯২৪ সালে ৬ জানুয়ারি রত্নগিরি থেকে মুক্তি পান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে, তিনি রত্নগিরি জেলের বাইরে যেতে পারবেন না। আন্দামানে কী অকথ্য অত্যাচারের ভিতর সাভারকরকে কাটাতে হয়েছিল, তা সেই সময় তাঁর সহবন্দিদের স্মৃতিচারণাতেই জানা যায়। একটি নির্জন সেলে হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখা হতো সাভারকরকে। যখন-তখন অকথ্য অত্যাচার করা হতো। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইলেকট্রিক শক। এই অত্যাচারে সাভারকরের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে রত্নগিরি কারাগারে সরিয়ে আনা হয়। রত্নগিরি কারাগার থেকে সাভারকরের মুক্তির বিষয়টি নিয়েই নেহরুপন্থী ও বামপন্থীরা কুৎসা রটনা করে থাকেন। অর্ধসত্য প্রচার করে থাকেন। নেহরুপন্থী ও বামপন্থীরা বলেন— ব্রিটিশের কাছে মুচলেখা দিয়ে সাভারকর জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কংগ্রেসের স্বল্পশিক্ষিত নেতা রাহুল গান্ধীও সাভারকরের সমালোচনা করতে গিয়ে এই একই কথা বলে থাকেন। ইতিহাসকে বিকৃত করার কংগ্রেসি ও বামপন্থী ঘৃণ্য প্রয়াসের এর থেকে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। একথা ঠিক, সাভারকর রত্নগিরি জেল থেকে শর্তাধীনে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তার পিছনেও সাভারকরের একটি রাজনৈতিক কৌশল ছিল। সেই কৌশলটি পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছিল। যেটি বামপন্থী ও নেহরুপন্থীরা সুকৌশলে গোপন করেন। কারাগারে ব্রিটিশ অত্যাচারে ভগ্নস্বাস্থ্য সাভারকর বুঝতে পারছিলেন, তাঁর বাকি জীবনটুকু যদি এই কারান্তরালেই কেটে যায়, তাহলে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা তাঁর আর সম্ভব হবে না। বরং কোনো কৌশলে যদি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে অন্তত গোপনেও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সাহায্য করা যায়, সেটাই উপযুক্ত হবে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। এবং সেই পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেও গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন না সাভারকর। সুভাষচন্দ্রের জার্মানি যাওয়া ও পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন— এর পিছনে ছিল সাভারকরের এক সক্রিয় অবদান। রাসবিহারী বসু জাপান থেকে সাভারকরকে অনুরোধ জানান, এক যোগ্য ভারতীয় যুবককে জাপানে পাঠাতে। যার নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যাবে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাভারকরের মুম্বইতে বৈঠকও হয়। অবশ্য তখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। পরে যখন সুভাষচন্দ্র জার্মানি হয়ে জাপানে পৌঁছন এবং গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী— তখন পরিষ্কার হয়ে যায় রাসবিহারী-সাভারকরের পরিকল্পনাটি। সাভারকর গবেষকরা এও বলেন, মুম্বইতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সেই বৈঠকেই সাভারকর রাসবিহারীর পরিকল্পনার কথা সুভাষকে জানান। এবং এই পরিকল্পনাটিই সুভাষচন্দ্র পরবর্তীতে কার্যকর করেন।

আসলে সাভারকররা কখনো হারেন না। হাজার কুৎসা তাঁদের ম্লান করতে পারে না। নেহরুপন্থী এবং বামপন্থীরা অজস্র কুৎসা রটাতেই পারেন বিনায়ক দামোদর সাভারকরের বিরুদ্ধে, তবু ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সাভারকর একজন ভাস্বর, মহান বীর হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন, থাকবেনও। স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন সাভারকর। মিথ্যা অভিযোগ এনে গান্ধীহত্যায় অভিযুক্ত করা হয় তাঁকে। অবশ্য আদালতে সে অভিযোগ ধোপে টেকেনি। বেকসুর খালাস পান সাভারকর। নির্লজ্জ কংগ্রেস সরকার সাভারকরের মতো বিপ্লবীর পারিবারিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো ঘৃণ্য কাজ করতেও পিছুপা হয়নি। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাকি জীবনটুকু সাভারকর লড়াই করেছেন সামাজিক ন্যায়ের জন্য। জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটিও স্মরণীয়। তবু, এই সাভারকরও শেষ জীবনে ভুগেছেন নিঃসঙ্গতা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। এই আপোশহীন, নিঃসঙ্গ যোদ্ধার প্রকৃত পর্যালোচনাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত সম্মান।

■

সেলুলার জেলে সাভারকরের সেলে নরেন্দ্র মোদী।

সাভারকর-বিরোধিতা কংগ্রেসের পরম্পরাগত ঐতিহ্য

সুজিত রায়

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে 'ভারতরত্ন' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব ওঠামাত্রই কংগ্রেস শিবির তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার আগে ঠিক যেভাবে বীর সাভারকরের নাম শুনলেই কংগ্রেস নেতাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যেত, আজ স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও সেই সাভারকরের নাম শোনা মাত্রই কংগ্রেসে একইভাবে প্রতিনিক্রিয়াশীল আচরণ প্রকট হয়ে উঠেছে।

কয়েকদিন আগেই কংগ্রেস মুখপাত্র মনীশ তিওয়ারি নাগপুরে বলেছেন, 'সাভারকরকে নয়, বরং নাথুরাম গডসেকে ভারতরত্ন দেওয়া হোক।' মনীশ তিওয়ারির এ ধরনের ব্যঙ্গাত্মক উক্তিকে সমর্থন জানিয়েই বিজেপি-কে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি-ও। মনীশের থেকে আরও দু'পা এগিয়েই রশিদ বলেছেন, 'সাভারকরের ইতিহাস সবার জানা আছে। সাভারকরের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। তবে তথ্য প্রমাণের অভাবেই তাঁকে মুক্তি দিতে হয়েছিল। আজ বিজেপি সরকার বলছে, তাঁকেই ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হবে। আমার আশঙ্কা, এরপর ভারতরত্ন প্রাপকদের তালিকায় নাথুরাম গডসের নামও হয়তো দেখতে পাব।'

কংগ্রেসের এই সাভারকার-বৈরিতা নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বৈরিতার ইতিহাস কালো অক্ষরে লেখা আছে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে। এবং সেই ইতিহাস যতটা বেদনাদায়ক, ততটাই নির্মম। যতটা মিথ্যাচার, ততটাই অমানবিক। যতখানি সাভারকর বিরোধিতা, তার চেয়ে অনেক বেশি দেশ- বিরোধিতা, দেশবাসী বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদী সত্তার বিরোধিতা।

কংগ্রেসের এই সাভারকর বিরোধিতার প্রথম এবং প্রধানতম কারণ হলো--- সাভারকর ছিলেন এক জাতি এক সত্তা তত্ত্বে বিশ্বাসী। সাভারকর ছিলেন ভারতবর্ষকে এক এবং অভিন্ন ও অখণ্ড রাখায় বিশ্বাসী। সাভারকর ছিলেন চাণক্যসম বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিবিদ। ঠিক যে যে কারণে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ভারতবর্ষে নেতাজী হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, ঠিক তেমনিভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রবেশের পর থেকেই সাভারকর হয়ে ওঠেন দেশ বিরোধী গণশত্রু। কারণ কংগ্রেস তথা মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুরা কোনোদিনই ব্রিটিশের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করেননি যা করেছিলেন সাভারকর। মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার অনেক আগে থেকেই সাভারকর বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি বরাবরই চেয়েছেন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে ভারত থাকুক অখণ্ড, আর সেই অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তিনি জাতীয়তাবাদের মন্ত্র 'হিন্দুত্ব'কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কংগ্রেস মনে করে, সাভারকরের এটা ছিল বিশাল অপরাধ। কারণ সাভাররের হিন্দুত্বের ভাবনাটা কংগ্রেস নেতারা ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। সাভারকর বলেছিলেন, যারা এই ভারতকে নিজের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করে। তাঁরাই ভারতীয়। হিন্দুত্ব তাঁর কাছে কোনও ধর্মীয় আগ্রাসন নয়। তিনি বলতেন, হিন্দুত্ব হলো একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা, একটি ভারতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং যাঁরা ভারতবর্ষে বাস করেন, তাঁরা সকলেই হিন্দু, যেমনটা বিশ্বের প্রায় সব দেশই মেনে চলে। তিনি ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হতেন, তার বিকাশ কামনা করতেন এবং বলতেন, এই বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত সংযোগের বাণী ছড়িয়ে যায় অবিরাম। এই মনোভাব থেকেই সাভারকর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন একটি অসাধারণ আবেগময় কবিতা যেখানে তিনি ভারতবর্ষকে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে এক হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। কবিতাটি

মারাঠি ভাষায় লেখা হলেও গোটা দেশেই চরম আবেগ তৈরি করে। ভয় পেয়ে যায় কংগ্রেস। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় মিথ্যা প্রচার— সাভারকর হিন্দুত্ববাদী। তিনি অন্য সব ধর্মের বিরোধী। কংগ্রেসের কাছে ধর্ম মানে ছিল হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি উপাসনা পদ্ধতি। কারণ ভোটের রাজনীতিতে বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে তা ডিভিডেন্ড দিত বেশি। সাভারকর ভোটের কাঙাল ছিলেন না। তাই তাঁর কাছে ধর্ম মানে ছিল আইনের অনুশাসন, দায়িত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এক নীতির বিধান। এত উচ্চমানের ভাবনা কি কংগ্রেস সহ্য করতে পারে?

না পারে না। যেমন পারেনি— সাভারকর যখন চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায় যোগ দিক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। যুদ্ধে যাক। কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্বল মস্তিষ্ক ধরতেই পারেনি যে কী কৌশলগত কারণে ভারতবাসীকে যুদ্ধে প্রশিক্ষণ নিতে বলছেন সাভারকর। তার দূরদৃষ্টি যে কতটা প্রখর ছিল তা প্রমাণিত হলো, স্বাধীনতার পর পাকিস্তান যখন কাশ্মীর দখল করতে সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগাল। ওই বাহিনীর মোকাবিলা করেছিলেন তাঁরাই যাঁরা সাভারকরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করতে শিখেছিলেন

সাভারকর ও নেতাজী।

এবং কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানকে হাত গোটাতে বাধ্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীতেও ছিলেন এই সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদেরই একটা অংশ। কংগ্রেসের গাত্রদাহ তো হবেই। এই সব বাহিনীই স্বীকার করে গেছেন, লিখে রেখে গেছেন রাসবিহারী বোস।

গান্ধী হত্যার সঙ্গে সাভারকরের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল না। হ্যাঁ, একথা সত্য, গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসে সাভারকরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু এই গডসেই তো হিন্দু মহাসভার কনফারেন্সে সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন সাভারকারের। ইতিহাস বলছে, যখন ব্রিটিশ শাসকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ভারত স্বাধীন হবে তবে ভারত হবে বিভাজিত। পাকিস্তানে সরকার গড়বে মুসলিম লিগ আর ভারতে কংগ্রেস, তখন হিন্দু মহাসভার কনফারেন্সে নাথুরাম প্রস্তাব রেখেছিলেন, বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেস সরকারকে বয়কট করুক হিন্দু মহাসভা। সাভারকর ওই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, 'একটা অবান্তর প্রস্তাব রাখছ তুমি। কংগ্রেস সরকার বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? একটি স্বাধীন দেশের সরকারকে কোনো দলের সরকার বলা যায় না। বরং জাতীয় সরকার হিসেবে তাকে সম্মান দেওয়া উচিত। আমরা হিন্দু মহাসভা

সেলুলার জেলে সাভারকর যে কক্ষে বন্দি ছিলেন।

একটি দায়িত্বশীল দল। দেশের সংবিধান মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। তোমাদের এরকম একনায়কতন্ত্রী মনোভাব হিন্দু মহাসভা এবং হিন্দু জাতি দুইয়ের পক্ষেই অপমানজনক।' নাথুরাম ক্ষুব্ধ হলেন এবং নারায়ণ আপ্তেকে সঙ্গে নিয়ে গড়লেন নতুন দল হিন্দু রাষ্ট্র দল। এই ইতিহাসই তো প্রমাণ করে, নাথুরাম- সাভারকর সম্পর্কে চিড় ধরেছিল! এই ইতিহাস তো এও প্রমাণ করে, সাভারকরের প্রতি কংগ্রেসের অকথ্য বিরোধিতার প্রতিশোধ নেওয়ার কথা একবারও ভাবেননি। সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসের পথ মসৃণ করে তুলেছিলেন তিনি। কংগ্রেস কৃতজ্ঞতার মান রাখেনি। গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে কংগ্রেসই ষড়যন্ত্র করে গ্রেপ্তার করাল সাভারকরকে। আর সেই চক্রান্তের মূল নায়ক ছিলেন মোরারজী দেশাই। যদিও আখেরে লাভ হয়নি কিছুই। নাথুরামের ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু সাভারকরকে মুক্তি দিয়েছে আদালত। কিন্তু মুক্তি কি অতই সহজ? জওহরলাল যে তখনও দিব্যি বেঁচে! সে ইতিহাসে আসছি একটু পরে। তার আগে আসা যাক আর এক চক্রান্তের ইতিহাস। সে ইতিহাস স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের।

কংগ্রেস তখন মোটামুটি ব্রিটিশের সঙ্গে রফা করে নিয়েছে কীভাবে আসবে স্বাধীনতা। আর সাভারকরের পিঠে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক এবং মুসলমান বিরোধী হিসেবে। অর্থাৎ এক কথায় দেশ বিরোধী— হ্যাঁ সেই মানুষটিই যিনি বলেছিলেন, রামধনু যেমন সব রঙের সমন্বয়ে অতি সুন্দর পটচিত্র হয়ে ওঠে, ভারতও সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের রামধনু রাষ্ট্র। যেখানে হিন্দুত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ইসলাম, ইহুদি, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমস্ত গুণাবলী। হ্যাঁ ওই দেশদ্রোহী অভিযোগেই বীর সাভারকরকে মিথ্যার দায়ে ব্রিটিশ আইনের 'ডি' তালিকাভুক্ত ভয়ংকর আসামি হিসেবে ৫০ বছরের মেয়াদে সাজা ঘোষণা করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আন্দামানের সেলুলার জেলে। ভারতের ইতিহাসে এত দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের আদেশ আর কোনও আসামির হয়নি। তেলের ঘানি টানা থেকে শুরু করে নানা পাশবিক অত্যাচারে বিধ্বস্ত সাভারকার বুঝে নিলেন, ব্রিটিশ সরকার তাকে আটকে রেখে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চাইছে। কংগ্রেসও চাইছে নিঃশর্তে ক্ষমতা দখল করতে। ওই অসহনীয় পরিবেশেও তিনি কৌশল করলেন। ঘোষণা করলেন, তিনি লিখিতভাবে আত্মসমর্পণ করবেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি দাবি জানালেন, তাঁর সঙ্গে মুক্তি দিতে হবে বাকি সব রাজনৈতিক বন্দিদের। মুক্তি পেলেন সাভারকর। কংগ্রেস এবং তাদের দোসর বামপন্থীরা আজও ঠাট্টা করে, সাভারকর পায়ে ধরে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা এই অপপ্রচারটা করে বেড়ান, তারা চেপে যান যে, সাভারকরের মুক্তির দাবি উঠেছিল কংগ্রেসের অন্দরমহল থেকেই। সরাসরি জওহরলাল বলেননি কিন্তু বলেছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি চিঠি লিখেছিলেন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবকে সাভারকরের মুক্তি দাবি করে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে একই দাবিতে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেলের বড়োদাদা বিট্টলভাই প্যাটেল। এমনকী স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় লিখেছিলেন যে সাভারকর ভাইদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া উচিত। একই ভাবে এফ অ্যান্ড্রুজ, কে ভি রঙ্গস্বামী আয়ার প্রমুখও সেই দাবিতে গলা মিলিয়েছিলেন। কিন্তু আন্দামান থেকে বেরুলেও সাভারকর 'স্বাধীন নাগরিক'-এর মর্যাদা পাননি। তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয় রত্নগিরি কারাগারে। জেলে বসেই লেখেন 'হিন্দুত্ব'। ১৯২৩ সালে বিট্টলভাই প্যাটেলের প্রস্তাবেই ফের মুক্তি পান সাভারকর।

কিন্তু জওহরলাল বেঁচে আছেন, শান্তিতে থাকবেন সাভারকর, তা কী করে হয়? তার ওপর গান্ধীহত্যার দায়মুক্ত হয়ে তিনি তখন মোরারজী দেশাইয়ের বিষ নজরে। অতএব ১৯৫০ সালে তাঁকে ফের গ্রেপ্তার করা হলো। অভিযোগ, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের ভারত ভ্রমণের প্রতিবাদ করেছেন। লিয়াকত আলি পাকিস্তানে ফিরে যাবার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো বটে। কিন্তু মাঝে মাঝেই হুমকি, বিরোধিতা, অশান্তি এসব লেগেই রইল। ১৯৬৩ সালের ৮ নভেম্বর আচমকাই মারা গেলেন সাভারকারের জীবনসঙ্গিনী যমুনাবাঈ। একা হয়ে গেলেন ভারতীয় রাজনীতির বিরোধী শিবিরের অন্যতম নায়ক। মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলল। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে তিনি সত্যিসত্যিই আত্মসমর্পণ করলেন। এবার নিজের কাছে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি জল, খাওয়া-দাওয়া এমনকী ওষুধ খাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন— আত্মসমর্পণ নয়, এটা তাঁর আত্মঅর্পণ। মৃত্যুর আগে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন। শিরোনাম : 'আত্মহত্যা নহী, আত্মঅর্পণ।' লিখলেন, যখন জীবনের লক্ষ্য শেষ হয়ে গেছে এবং সামাজিক সেবাকার্যের ক্ষমতাও আর নেই, তখন শুধু শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে স্বেচ্ছায় জীবনদান করাই শ্রেয়।

১৯৬৬-র ২৬ ফেব্রুয়ারি সাভারকরের আত্মঅর্পণ কর্মসূচি শেষ হলো। তিনি মৃত্যুকে আবাহন করে নিলেন। তখন তাঁর বয়স ৮৩। কংগ্রেসের রাগ কি কমল? না। কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সর্বস্তরে হুলিয়া জারি করা হলো, কেউ সাভারকররের স্মরণে অনুষ্ঠিত কোনো সভায় অংশ নিতে পারবে না। হয়তো কংগ্রেস কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে, হাজার চেষ্টা করেও সাভারকরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যায়নি।

মাঝে কেটে গেছে ৬৩টা বছর। কম সময় নয়। তবুও মনীশ তিওয়ারিরা সক্রিয়। না, কিছুতেই সাভারকরকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া যাবে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ অবশ্য একটু প্রত্যয়ী মনোভাবই দেখিয়েছেন। তিনি আজকের নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সাভারকরের নামে পোস্টাল স্ট্যাম্প উদ্বোধন করেছিলেন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই। তাঁর মতামত, ব্যক্তি সাভারকর নয়, বরং তাঁর মতবাদের বিরোধী কংগ্রেস। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটিই বিষয়টি সম্বন্ধে ভেবেচিন্তে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ভুললে চলবে না, মনমোহন সিংহের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় মণীশ তিওয়ারিরা। অতীতের সেই সাভারকর বিরোধিতার ইতিহাস কংগ্রেস ভুলবে কী করে। দল যায় যাক! ঐতিহ্য, পরম্পরা তো আর বিসর্জন দেওয়া যায় না! ■

সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেসি সমালোচনা ঃ প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা

বিমল শঙ্কর নন্দ

ইতিহাসের গতি স্বয়ংক্রিয় নয়। এই গতি নির্ধারণ করে মানুষ। এ কারণে ইতিহাস হলো সচেতন কর্মপ্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। আবার ইতিহাসের গতিপথে ব্যক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে তার সামগ্রিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তা করা প্রয়োজন। সামগ্রিক ভূমিকার একটি খণ্ডিত অংশকে নিয়ে যারা বার বার কোনো ব্যক্তির ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে চায় তাদের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় সাভারকরকে নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি করা হয় তার পিছনেও রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। কেবল সাভারকরকে ছোটো করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিতর্ক তৈরি করা হয় না। এই বিতর্কের লক্ষ্যই হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি ধারাকে ভুলিয়ে দেওয়া। ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনার ভিত্তি যে জাতীয়তাবাদ তাকে গুরুত্বহীন করা। সর্বোপরি হিন্দুত্ব যে ভারতের জাতীয় চেতনার ভিত্তি হতে পারে তাকেও যতটা সম্ভব ছোটো করা। তাতে ঐক্য নয়, বৈচিত্র্যের দিকটি বেশি করে তুলে ধরা হয়। এতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত দেশভাগের সময় বামপন্থীরা যে কদর্য ভূমিকা পালন করেছিল তাকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে। অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও দেশভাগ ও তৎপরবর্তী সময় লক্ষ লক্ষ হিন্দুর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার জন্য কংগ্রেস তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। উপরন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দু'দশকের মধ্যেই গোটা কংগ্রেস দল ঢুকে পড়ে পরিবারতন্ত্র এবং চাটুকাকিতার আবর্তে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেহরু পরিবার ছাড়া আর কারোর গুরুত্বকে তুলে ধরার (একমাত্র ব্যতিক্রম গান্ধীজী) প্রয়োজন বোধ করেনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের মদতপুষ্ট ঐতিহাসিকরা। সাভারকরের কৃতিত্বকে চাপা দেওয়া এবং ভূমিকাকে ছোটো করে দেখানো হয় একটি সুনির্দিষ্ট মতলব নিয়েই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতীয় সমাজ ও জাতীয়তার গঠনে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অবদান কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, এর বিভিন্ন দিক এখনো জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের চর্চার বিষয়বস্তু। সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম ও কংগ্রেসের অনুগ্রহপুষ্ট ঐতিহাসিকদের সমালোচনা মূলত দুটি খাতে প্রবাহিত হয়। প্রথমত, এদের অভিযোগ অনুযায়ী সাভারকর একজন হিন্দুত্ববাদী। কেবল হিন্দুত্ববাদীই নয়, তাঁর ভাবনাচিন্তায় নাকি আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদের সন্ধান পাওয়া যায় যা বৈচিত্র্যময় বহুজাতিভিত্তিক দেশ ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে বিপজ্জনক। সাভারকর-কল্পিত ভারতে সংখ্যালঘুদের স্থান নেই। হিন্দুত্বের আরোপিত ঐক্য দিয়ে বৈচিত্র্যময় দেশ ভারতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু পশ্চিমি গণমাধ্যম সাভারকরকে দক্ষিণপন্থী গরিষ্ঠতাবাদী (right wing majoritarian) বলে চিহ্নিত করেন। সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেসি ইতিহাসবিদদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে। এখানে সমালোচনার প্রধান কারণ আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকার সময় সাভারকর একাধিকবার (মোট ৪ বার) নাকি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছ ক্ষমাভিক্ষা করছেন এবং শর্তসাপেক্ষে ছাড়া পান। সুতরাং তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। এই অভিযোগগুলো শুধু বামপন্থী ও কংগ্রেস সমর্থক ইতিহাস লেখকদের নয়, বামপন্থী দলগুলি এবং কংগ্রেসের নেতারাও একই ধরনের অভিযোগ করেন। সম্ভত এই সমস্ত ইতিহাস লেখকের ভাবনাকে জনগণের চোখে বৈধ প্রতিপন্ন করতে।

হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গের সঙ্গে বীর সাভারকর।

ইতিহাসের গতিপথে কোনো ব্যক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁকে তাঁর সময় দিয়েই বিচার করা উচিত এবং যতটা সম্ভব নির্মোহ ভাবে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে হিন্দুত্ববাদের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক বীর সাভারকর, যার ব্যাখ্যায় হিন্দুত্ববাদ হিন্দুধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক রাজনৈতিক মতাদর্শে উপনীত হয়। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে অন্যান্য মতাদর্শের উত্থান ও বিস্মৃতির সঙ্গে সাযুজ্য

বজায় রেখে হিন্দুত্ববাদের গঠন (construction) করেন সাভারকর। গড়ে তোলেন আধুনিক হিন্দুত্বের ধারণা। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় সাভারকরের হিন্দুত্ব গ্রন্থটি যা দার্শনিক মনীষার অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ। এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল জেলখানায় এবং প্রকাশিত হয়েছিল 'জনৈক মরাঠা' ছদ্মনামে। এই সঙ্গে সাভারকর হিন্দু জাতীয় চেতনার উৎস এবং বিকাশের ধারাটিকে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে তিনি এবিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যেমন, 'হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন' ও 'ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের ছয়টি স্বর্ণিল অধ্যায়' প্রভৃতি। সাভারকারের কাছে হিন্দুত্ব নিছক একটি শব্দ নয়, এ এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। হিন্দুত্ব কেবল আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ইতিহাস নয়। 'হিন্দুইজমের সঙ্গে হিন্দুত্বের পার্থক্য আছে। ইজম্ শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব বা সূত্র। হিন্দুইজম্ একটি ধর্মীয় শব্দ আর হিন্দুত্ব একটি ব্যাপক ভিত্তিক শব্দ যা মূলত রাজনৈতিক এবং এর মধ্যে সামাজির, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও বিদ্যমান, সাভাকরের কাছে হিন্দুইজম্ ছিল হিন্দুত্বের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। এর উৎপত্তিও হিন্দুত্ব থেকে। অর্থাৎ সাভাকরের হিন্দুত্ব ভাবনাটি কেবল ধর্মীয় তাৎপর্যবাহী নয়। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হিন্দুত্ব গ্রন্থে সাভারকর হিন্দু জাতি গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক, জাতিগত এবং ঐতিহ্যগত কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, এর উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে অসীম মহাসাগর ভারতীয় ভূখণ্ডকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই স্বাতন্ত্র্যই বহু বছরের প্রক্রিয়ায় গড়ে তুলেছে একাত্ববোধ সম্পন্ন হিন্দু সংস্কৃতি যা হাজার উত্থান-পতন সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যায়নি। হিন্দুত্বের এই দীর্ঘ লালিত একত্ববোধ বা সর্বসমাবেশকতা তার বড়ো শক্তি। মুসলমান বা খ্রিস্টানরা ধর্মীয় গোষ্ঠী হলেও তাদের কোনো ভৌগোলিক বন্ধন নেই। ফলে একক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তারা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভারতবর্ষ হলো হিন্দুদের পবিত্র পিতৃভূমি, অন্য ধর্মের মানুষরা ভারতকে বাসভূমি হিসবে গ্রহণ করলেও তাদের আনুগত্য এই দেশের প্রতি থাকে না। ভারতের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে তাদের মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে সাভারকর হিন্দুত্বের য ধারণা নির্মাণ করেন তার একচি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জীবনধারাগুলিকে এক করে এক বৃহৎ মনোলিথিক বা এক জাতি হিসেবে উপস্থাপনা। পাশাপাশি সাভারকরের ভাবনায় ভারতে উদ্ভূত অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী যেমন বৌদ্ধ, জৈন ও শিখরাও সমানভাবে সমাদৃত। 'হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন' গ্রন্থে সাভারকর মন্তব্য করেন যে, হিন্দুধর্ম হলো আসলে একটি সংস্কৃতি যার সঙ্গে এই সমস্ত ধর্মীয় মত ও পথগুলি কোনো না ভাবে সম্পর্কিত। এগুলিকে তিনি 'অবশিষ্ট হিন্দুধর্ম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জাতিগত ও সংস্কৃতিগত ভাবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে এরাও ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদের যতটুকু পার্থক্য আছে তা দূর করা প্রয়োজন। এদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। এই পথেই ভারতের মতো দেশে এর সর্বসমাবেশক জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা সম্ভব। সাভারকর তাঁর এই রাজনৈতিক প্রকল্পে মুসলমান বা খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। কারণ এদের আনুগত্য রয়ে যায় দেশের বাইরে– আরবে বা প্যালেস্টাইনে। যদি তারা ভারতকে তাদের পিতৃভূমি বলে মেনেও নেয়, তবু ভারত তাদের কাছে পবিত্রভূমি নয়। তাদের পবিত্রভূমি ভারতের বাইরে অন্য কোথাও। তাদের যদি হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হয় তাহলে তাদের ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি ও পবিত্রভূমি দুটোই মনে করতে হবে। তা না হলে এই দেশ তাদের হবে না। হিন্দুত্ব গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন তাদের যদি ভারতবর্ষে থাকতেই হয় তবে তাদের এটা মানতেই হব যে, ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ।

হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক প্রবক্তা বীর সাভারকর প্রকল্পিত হিন্দু ভারতে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ও ধর্মীয় পরিচয় মুছে দেওয়ার পক্ষপাতী নন, বরং তাদের ধর্মীয় সামাজিক অধিকার বজায় রাখার পক্ষপাতী তিনি। তিনি হিন্দু রাষ্ট্রগঠন গ্রন্থে তাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করার কথা বলেছেন। তাদের ধর্মাচরণের অধিকার নিশ্চিত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তারা হিন্দুদের মতোই সমান অধিকার ভোগ করবে। সংখ্যালঘুরা যেমন তাদের ধর্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ করতে পারবে, হিন্দুরাও তাদের নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারবেন। সংখ্যালঘুদের অনৈতিক স্বার্থে কোনো আপোশ করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আলাদা কোনো সুযোগসুবিধা পাবে না। সাভারকর মনে করতেন তাদের আলাদা কোনও সুযোগসুবিধা দেওয়ার অর্থই হলো এদেশে তাদের আধিপত্য মেনে নেওয়া। এখানেই জওহরলাল নেহরুর ধর্মনিরপক্ষতার ধারণার সঙ্গে সাভারকরের ভাবনার পার্থক্য। নেহরু মনে করতেন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার দায়িত্ব শুধুমাত্র এদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের। ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে সংখ্যালঘুদের বিশেষ কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হলেও সংখ্যাগুরুদের তা মেনে নেওয়া উচিত। সাভারকরের অভিমত ছিল সংখ্যালঘু সংরক্ষণের স্বার্থে তাদের ক্রমশ সুযোগসুবিধা দিতে থাকলে সংখ্যগুরু হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। তাতে ব্যাহত হবে দেশ গঠনের কাজ। একটি রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী হতে পারে যখন তার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এর সুখ-দুঃখের ভাগিদার হতে পারবে। এই কারণেই সাভারকর হিন্দু জাতির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংহতির ধারণাকে গ্রহণ করেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী ধারণা থেকে উঠে আসেনি। এর পিছনে কাজ করছিল তাঁর গভীর দেশপ্রেম।

সুতরাং সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেসি ইতিহাস লেখক এবং রাজনীতিবিদদের যে প্রধান অভিযোগ অর্থাৎ সাভারকর একজন সাম্প্রদায়িক এবং তাঁর কল্পিত রাষ্ট্র ভাবনায় হিন্দু ছাড়া আর কারো স্থান নেই তা কেবল ভিত্তিহীন নয়, তা চূড়ান্ত ভাবেই দুরভিসন্ধিমূলক। সাভারকরের রাজনৈতিক ভাবনার প্রেক্ষাপট বিচার না করে কেবল কতগুলি অংশ তুলে নিয়ে তার সমালোচনা একদেশদর্শিতার ইঙ্গিত বহন করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু পরিচিতির অনুসন্ধান এবং তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ে স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁর অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (পরবর্তীকালে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে আলিগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে তা শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচিতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পরিণত হয়। এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন

দীর্ঘায়িত করতে ব্রিটিশরাও 'বিভক্ত করো ও শাসন করো' নীতি অনুসরণ করে মুসলমানদের এই অন্দোলনকে মদত দিতে থাকে। অন্যদিকে এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করলেও ১৯ শতকের শেষে এসে জনজীবন, শিক্ষাক্ষেত্র কিংবা প্রশাসন– সর্বক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুরা প্রান্তিক অবস্থানে চলে যেতে থাকে। পালটা, ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির প্রকল্প নির্মাণের অঙ্গ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু পুনর্জাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রয়োজনে বিচিত্রগামী ও বহুধাবিভক্ত হিন্দু সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হিন্দু সমাজকে একটি মনোলিথিক বা একমাত্রিক এককে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এর সীমাবদ্ধতাগুলিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় এবং পশ্চিমি যুক্তিবাদের নিরিখে একে আধুনিক করার চেষ্টা করা হয়। এই ভাবনার তাত্ত্বিক সূচনা ঘটেছিল বঙ্গপ্রদেশে প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখার মধ্য দিয়ে। এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বদেশি আন্দোলনের যুগে শ্রীঅরবিন্দ ও মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক তাঁদের রাজনৈতিক ভাবনা নির্মাণ করে কাজকর্ম পরিচালনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা সৃষ্টি করেন তার ভিত্তি হলো হিন্দু ঐতিহ্য। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি থেকে ভাবনা গ্রহণ করে সৃষ্টি হওয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অরবিন্দের মতে কোনো সংকীর্ণ ধারণা নয়। বরং এর ব্যাপ্তি অনেক বড়ো, যার মধ্যে সকলের স্থান হতে পারে। তিলক তাঁর ধারণা ও রাজনীতির মধ্যে হিন্দুধর্মের গৌরব ও শৌর্যের প্রতীকগুলিকে গ্রহণ করেন। লক্ষ্য ছিল একটিই– এক শক্তিশালী জাতিগঠন যার ভিত্তি হবে হিন্দুত্ব। সাভারকর তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার সূচনাপর্বে তিলকের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এভাবেই ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং হিন্দু নেশনের ধারণা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সাভারকরের ভাবনায় এই ধারারই প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর লক্ষ্যই ছিল একটি শক্তিশালী জাতি ও রাষ্ট্রগঠন, তার ভিত্তি হবে হিন্দুত্ব। এই হিন্দুত্ব কেবল ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ নয়। ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে তা হয়ে ওঠে একটি আদর্শ, যা দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাভারকরকে ধর্মীয় সংকীর্ণতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত করা তাত্ত্বিক দৈন্যের পরিচায়ক। বাম ও কংগ্রেসি ইতিহাস লেখকরা সাভারকরের সমালোচনা করে তাঁদের তাত্ত্বিক দৈন্যেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেসি ইতিহাস লেখকদের আর একটি অভিযোগ হলো আন্দামান সেলুলার জেলে থাকাকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে মুক্তি চাওয়া। তাঁর প্রকৃত দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে দেখানো হয়। যাঁরা সাভারকরের আত্মজীবনী 'মাই ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ' পড়েছেন তাঁরা এই দাবি কতখানি ভিত্তিহীন তা বুঝতে পারবেন। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ' আন্দামানে আমি যতটুকু ভালো করতে পেরেছি বা মানুষের মধ্যে যতটুকু চেতনা সঞ্চারিত করতে পেরেছি, স্বাধীন মানুষ হিসেবে ভারতে থাকলে তা করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। নিজের স্বাধীনতার জন্য আমি এমন কিছু করতে পারি না যা বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল, যাতে দেশের মাথা হেঁট হবে। এই ভাবে স্বাধীনতা পেলে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা হবে অত্যন্ত অনৈতিক কাজ।' সাভারকর ছত্রপতি শিবাজীর নীতি ও কৌশল অনুসরণ করতেন। আফজল খাঁর হত্যার সময় কিংবা আগ্রা দুর্গে বন্দি থাকার সময় শিবাজীও বিভিন্ন কৌশল নিয়েছিলেন যার প্রধান লক্ষ্য ছিল শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া। নিজের দুর্বলতার সময় পুরন্দরের সন্ধির অপমানজনক শর্ত মেনে নিলেও যখনই শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তখনই তার প্রতিশোধ নিয়েছেন শিবাজী মহারাজ।

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় সাভারকর ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। সেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ব্রিটিশরা যদি হিন্দুস্থানকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয় এবং সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দেয় তবে বিপ্লবীরাও ইংরেজদের সাহায্য করবে। সেসময় ইউরোপে বিভিন্ন সরকার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিচ্ছিল এমনকী আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সাভারকর তারও উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন, 'ব্রিটিশরা সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিক। আমাকে মুক্তি না দিলেও আমার আপত্তি নেই। আমি আন্দামানের নির্জন কক্ষে বসে বন্দিদের মুক্তিতে আনন্দ করবো।'

মুক্তি পেলে রাজনীতি করবেন না এই শর্ত তিনি কেন মেনে নিলেন এ ব্যাপারেও সাভারকরের বক্তব্য পরিষ্কার। তাঁর ভাষায়, ''একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি রাজনীতিতে অংশ না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। জেলে বসে আমি রাজনীতি করতে পারতাম না। জেলের বাইরে আমি অন্য ধরনের কাজ করতে পারি যেমন শিক্ষা, ধর্মীয় বা সাহিত্য রচনার কাজ এবং এভাবেই দেশের সেবা করতে পারি।'' তিনি বুঝেছিলেন যে আন্দামানের সেলুলার জেলের ভয়াবহ পরিবেশ তিলে তিলে শেষ হয়ে যাওয়ার চেয়ে জেলের বাইরে থেকে দেশ গঠনের কাজে এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই মুসলিম লিগ গঠন, ব্রিটিশের বিভাজন নীতি, জিন্নার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তা প্রতিরোধে কংগ্রেসের সীমাহীন ব্যর্থতা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। এই সময় প্রয়োজন ছিল হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং হিন্দুত্বকে একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা ও জনপ্রিয় করা। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটিছিলেন সাভারকর। সেলুলার জেলের প্রাচীরের আড়ালে যদি তিনি জীবন অতিবাহিত করতেন তবে সমগ্র হিন্দু সমাজকে এক করার করার কাজ আর কারো দ্বারা হতো কিনা সন্দেহ। ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত ভারতবর্ষ। সুতরাং সাভারকরের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেসি ইতিহাস লেখক এবং রাজনীতিকদের সমালোচনা শুধু ভিত্তিহীন নয়, তা দুরভিসন্ধিমূলকও। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে সামগ্রিক বিচার না করে তাকে খণ্ডিত ভাবে দেখলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতি সুবিচার করা হয় না। আজকের শক্তিশালী উন্নত ভারতের অন্যতম রূপকার বিনায়ক দামোদর সাভারকর। বাম-কংগ্রেসিদের চোখে না হলেও জনগণের চোখে তিনি বীর। আর গণতন্ত্রে জনগণের মতই শিরোধার্য। ■

চিঠিপত্র

ভারতবর্ষকে সবাই মামার বাড়ি ভাবছে

সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বেড়েই চলেছে। জানিয়েছেন হিন্দু মহাজোটের সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। হ্যাঁ একথা সত্যি ভারতের জল ছাড়লে বাংলাদেশে বন্যা হবেই এ আর নতুন কী। কিন্তু তাই বলে ভারত তার নিজস্ব খুঁটিটাকে জোরদার করবে না কেন! কারণ প্রতিটা দেশেরই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নজর অবশ্যই দেওয়া দরকার। আর তাছাড়া ও দেশের বেশিরভাগ মানুষের সদিচ্ছা ওখানকার হিন্দুরা যেন ভালোভাবে ভারতে এসে জায়গা করে নিতে পারে। তাতে তাদের ভারও কিছুটা কমলো, আর হিন্দুরাও ভালো থাকলো। ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ভাঙার পর অত্যাচারটা কোনো দেশেই কম হয়নি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, এখানকার একটি সম্প্রদায় মন্দির ভাঙাতে উৎসাহ বোধ করেছিলেন। কারণ তাতে নাকি ওদের অন্তর জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হবে। আর বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন সে তো হুকোয় তামাক টানার মতো। ওরা তো সেই ৪৭ সাল থেকে লেগেই আছে। হ্যাঁ, গোবিন্দবাবুর কথায় যুক্তি আছে। কারণ এ দেশের নিরাপত্তার ব্যাপার ওদেশে সংঘাতে পরিণত হচ্ছে। এখন যদি রাম মন্দির তৈরি হয়, ও দেশে হিন্দু নির্যাতন শুরু হবে, এনআরসি হলে ধর্ষণ শুরু হবে, হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা হলে রায়ট শুরু হবে। তাহলে তো কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যাবে না। এদিকে কাঁটাতারের বেড়ারও প্রয়োজন নেই। যখন খুশি সবাই মামার বাড়িতে এসে আনন্দ ফুর্তি করবে। কারণ এটাতো মামার বাড়ি, কারো কিছু বলার নেই। এই পনেরো কুড়ি দিন আগে বাংলাদেশের সাতজন ধরা পড়েছিল, সেটার ছিল বনগাঁ বর্ডার। আবার ১৮ অক্টোবর গাইঘাটায় ধরা পড়েছে সাতজন— হিলাল, বিলাল, হজরা শেখ ইত্যাদি। এরা অনবরত আসছেই। এভাবে প্রশ্রয় দিলে মামাদেরই ভাগ্নেদেরকে রেখে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

খণ্ডিত ভারতে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী

পরাধীন ভারতবর্ষে সেরা রাজনীতিবিদ ও ভারত সংস্কৃতি অহিংসা মতাদর্শে অটল ব্যক্তিত্ব গান্ধীজী। ভারতবাসীর চেতনা জাগরণেও তিনি অদ্বিতীয়। ১৯৯৩ সালে গান্ধীজী একটি জটিল মামলার দায়িত্বভার গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস গঠন করেন এবং শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যান। আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের নির্যাতিত সকল মানুষের একটি মঞ্চ গঠন করেন এবং বিশ্বে মানবতাবাদী বিশেষ ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিভাত হন।

১৯১৪ সালে গান্ধীজী দেশে প্রত্যাবর্তন করলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেন। অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন, একমাত্র আত্মার বলে বলিয়ান গান্ধীজী জাতিগঠনে ও স্বাধীনতা অর্জনে অহিংসা অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড়ো, ব্রিটিশ পণ্যবর্জন প্রভৃতি বহু আন্দোলন সংগঠিত করেন। পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত ও ৩১০ জন আহত হলে গান্ধীজী কাইজার-ই-হিন্দ পদক প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু অহিংস আন্দোলনকে সহিংস রূপ দেননি। আমরা যদি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরবর্তী নেলসন, ম্যান্ডেলার মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস দেখি— দেখতে পাব আফ্রিকার শাপভিল নামক স্থানে শ্বেতাঙ্গদের গুলিতে ৭০ জনের মৃত্যু ও ১৭৬ জন কৃষ্ণাঙ্গ আহত হলে নেলসন ম্যান্ডেলা অহিংস আন্দোলনকে সহিংস রূপ দান করেন। এতে প্রমাণ করে গান্ধীজী অহিংসায় কতটা অটল ছিলেন। পরবর্তী রাজনীতির বহু টানাপোড়েন ঘটলেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে 'জাতির জনক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম লিগ দ্বিজাতি তত্ত্বে মুসলমানদের জন্য আলাদা বাসভূমি পাকিস্তান দাবি করে। ভারতের কমিউনিস্টরা দাবি করেন 'পাকিস্তান দিতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' ফলে ভারতের বহু স্থানে মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিরীহ হিন্দুদের হত্যা শুরু হয়। বিশ্বের অহিংস ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। শুধু তাই নয়, আমরা যদি অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখি— দেখব গান্ধীজী বিশ্ব মানবপ্রেমিক অহিংস ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা হয়েছে। আর দৌহিক মৃত্যু ঘটিয়েছে নাথুরাম গড়্‌সে। তাই বলা যায় প্রত্যক্ষ হিংসায় ও পরোক্ষ হিংসায় দুই ভাবে মানব প্রেমে অহিংসায় অটল ব্যক্তিত্ব মহামানব গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। এটি ভারতবাসীর অতীব লজ্জার। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় নেওয়াখালিতে গিয়ে নিরীহ হিন্দু রক্তের গঙ্গাধারা দেখে মহাত্মা মহোনদাস করম চাঁদ গান্ধী দুঃখ করে বলেছিলেন— সুভাষের কথা না শুনে আমি বড়ো ভুল করেছি।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিভাঙা-২,
কোচবিহার।

হিন্দুদের নিস্তার নেই

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশে হিন্দুরা নিয়মিতভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে নিগৃহীত হচ্ছে, মন্দির অপবিত্র করা হচ্ছে, প্রতিমা ভাঙা হচ্ছে, দেবোত্তর সম্পত্তি, শ্মশানভূমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে, হিন্দু কন্যা অপহৃতা হচ্ছে, ধর্ষিতা হয়ে ধর্মান্তরিতা হচ্ছে বাধ্য হয়ে, হিন্দুরা পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে প্রাণরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। তবুও নিস্তার নেই। এখানেও অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হচ্ছে। অথচ এসব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কোনও হেলদোল নেই। তারা পুজোর আনন্দোৎসব, দেশভ্রমণ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি নিয়ে মহাব্যস্ত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা সম্প্রতি চারদিন ভারতসফর করে গেলেন। আমাদের রাজনীতিকরা এবিষয়ে শেখ হাসিনাকে কোনো প্রশ্ন করেছিলেন কিনা জানা গেল না।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার, চন্দননগর।

প্লাস্টিক বর্জনে মহিলাদের অগ্রণী হতে হবে

সুতপা বসাক ভড়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশে বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জনের অভিযান চলছে। প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসে খাদ্যপদার্থ রাখলে শরীরের ওপর দুষ্প্রভাব পড়ে। প্রায়ই

বলা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞান অনেক সময় আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্লাস্টিক হলো একদম সঠিক উদাহরণ। প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে অলস এবং অসুস্থ বানিয়েছে। চারদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব যে জলের বোতল থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, মোবাইল, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, লেখা-পড়া, রান্নাঘরের সরঞ্জামাদি প্রায় সবকিছুই প্লাস্টিক থেকে তৈরি, যা বায়োডিগ্রেডেবল নয়।

আমরা পৃথিবীর মাটি, হাওয়া এবং জলে ক্রমাগত প্লাস্টিক জমিয়ে দূষণ স্তর বাড়িয়ে চলেছি। একটি জলের বোতল সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে বা ডিগ্রেড হতে প্রায় চারশো বছর লাগে। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক বছরে মোটামুটি এগারো কিলোগ্রাম প্লাস্টিক ব্যবহার করে। ভারতের প্রতিদিন ২৬,০০০ টন প্লাস্টিকের জঞ্জাল জমা হয়। প্লাস্টিক জনিত দূষণ দিনে দিনে বেড়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

পরিবেশ দূষণের সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক আমাদের শরীরের ওপরেও প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। মোটামুটি সাত প্রকার প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এইসব প্লাস্টিক কম-বেশি হলেও খুবই হানিকারক। প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক রসায়ন হলো— (১) বিএসএ অর্থাৎ বিসফিনাল, (২) থ্যালেট্স, (৩) অ্যান্টিমনি বি, (৪) ক্যাডমিয়াম, (৫) লেড ইত্যাদি। বিএসএ এবং থ্যালেট্স রক্তের সঙ্গে মিশে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির কাজ অনিয়মিত করে দেয়। এই রসায়নগুলি মোটা হওয়া, সুগার, পিসি ওডি, থাইরয়েড ইত্যাদি সমস্যার জন্য দায়ী। ফলস্বরূপ, আমাদের শরীরে বিভিন্ন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়।

প্লাস্টিক আমাদের খাদ্যপদার্থ এবং জলের সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক পাচনক্রিয়াকে ব্যাহত করে। পেটব্যথা, বদহজমের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে। মাইক্রোওভেনে প্লাস্টিকের বাসনে খাবার গরম করলে প্লাস্টিক স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ৫০ গুণ বেশি পরিমাণে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। সেইরকম জলের বোতল যত বেশি রোদে রাখা হবে, তার মধ্যে ততবেশি পরিমাণে বিষাক্ত কণা থাকবে। প্লাস্টিকের বাসন বারবার ব্যবহার করতে থাকলে আমাদের শরীরে ক্ষতিকর পদার্থ বেশি পরিমাণে পৌঁছায়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে যে প্লাস্টিকের থ্যালেটস এবং অন্যান্য রসায়নগুলি স্তন, ফুসফুস এবং কিডনি সংক্রান্ত ক্যানসারের জন্য দায়ী। যখন প্লাস্টিক জ্বালানো হয়, তখন তা থেকে ক্ষতিকারক গ্যাস বেরোয়। এর ফলে চোখ জ্বালা, চোখ লাল হওয়া এবং চোখ থেকে জল বেরোতে থাকে। প্লাস্টিক কণাগুলি ব্রঙ্কাইটিস এবং হাঁপানির মতো অসুখের জন্য দায়ী। ত্বকের চুলকানি এবং শরীরে নানারকম দাগ প্লাস্টিকের অত্যাধিক ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে। প্লাস্টিকের জন্য পৃথিবীর উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে। নদী-সমুদ্রে ব্যাপকহারে মাছ ধরে খাবার মতো ঘটনা বেড়ে চলেছে। গ্রীন হাউস এফেক্টের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রাও বাড়ছে। এসবের জন্য দায়ী আমরা, এর কুফল ভুগছি আমরা, সুতরাং এর থেকে বাঁচার পথ আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু পরিবর্তন করে নিলে আমরা প্লাস্টিকের দুষ্প্রভাব থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারি। যেমন প্লাস্টিকের পরিবর্তে স্টিলের বোতল এবং গ্লাস ব্যবহার করতে পারি, কারণ পানীয় জল, ফলের রস, ঠাণ্ডা পানীয় ইত্যাদির বোতলগুলি পি ই টি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়, সেজন্য এর ক্ষতিকারক রসায়নগুলি জলে মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্যাকেটের খাবার এবং পানীয়ের ব্যবহার যত সম্ভব না করাই ভালো। শিশুদের দুধ বা জলের বোতলে বি এস এ চিহ্ন দেখে তবেই কেনা ভালো। বাচ্চাদের প্লাস্টিকের টিফিনকৌটোর পরিবর্তে স্টিলের টিফিন কৌটো এবং বোতল দিন। খাবার কখনই প্লাস্টিকের মোড়কে রাখা উচিত নয়। প্লাস্টিকের বাসনে খাবার গরম করা উচিত নয়। মাইক্রোওভেনের নিয়মিত ব্যবহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সেজন্য মাইক্রোওভেনের ব্যবহার পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। জলের ট্যাঙ্ক স্টিল, ইট-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হলেই ভালো। প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ককে রোদ থেকে বাঁচানো জরুরি। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক যেমন বোতল, গ্লাস কাপ প্লেট ইত্যাদি ব্যবহার করাই উচিত নয়।

এই আলোচনা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্লাস্টিক বর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের মহিলাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমাদের প্রয়াসে আমরা এবং আমাদের প্রত্যেকের নিকটজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যাগুলি অনেকটাই কম করতে পারি। সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে সুস্থ পরিবেশ, সমাজ, দেশ গড়ে তুলি। প্লাস্টিকমুক্ত ভারত গড়ে তুলি!

চোখের শুষ্কতা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কাজের জন্য একটানা তাকিয়ে থাকতে হয় কমপিউটারে ও ল্যাপটপের দিকে। বাড়িতে ফিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকার কারণে স্মার্টফোন বা ল্যাপটপেই চোখ আটকে। অথবা দীর্ঘ সময় টিভির পর্যায় বুঁদ রয়েছেন কিংবা ভিডিও গেম খেলায় মশগুল? এতে যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আপনার চোখ, সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন কি? চোখের জল শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন অনেক মানুষ। ড্রাই আইজ ডেকে আনতে পারে অন্ধত্ব। ড্রাই আইজ বা শুষ্ক চোখের সমস্যার একাধিক কারণের মধ্যে একটানা অনেকক্ষণ স্ক্রিনে আটকে থাকাকে চিকিৎসকেরা প্রধান কারণ বলে মনে করছেন।

চোখের উপরে জলের একটি পাতলা স্তর থাকে। জল, তেলপিচ্ছিল মিউকাস এবং জীবাণুরোধী অ্যান্টিবডি দিয়ে তৈরি এই চোখের জল। চোখের গ্রন্থি থেকে কোনও কারণে জল নিঃসরণ কম হলে চোখ শুষ্ক হয়ে পড়ে, সমস্যা দেখা দেয় তখনই। চক্ষু বিশেষজ্ঞ জানালেন 'চোখে যথেষ্ট পরিমাণে জল তৈরি না হলে বা সেই জল লুব্রিক্যান্ট হিসাবে যথেষ্ট না হলে চোখ করকর করে জ্বালা ভাব অনুভব হয়। আলোর দিকে তাকানোও যায় না। মিউকাসে ভরে যায় চোখ, ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি।'

ঝুঁকি কাদের বেশি?

বয়স বাড়লে, ৫০-এর ঊর্ধ্বে এই সমস্যা বাড়ে। মহিলারা মেনোপজের পরেও এই সমস্যায় ভুগতে পারেন। আবার অতিরিক্ত এসি ঘরে বেশি সময় থাকলেও ড্রাই আইজ আশঙ্কা থাকে। প্রতিনিয়ত দূষিত আবহাওয়াও শুষ্ক চোখের কারণ হতে পারে। আবার কোনও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া শোগ্রেন

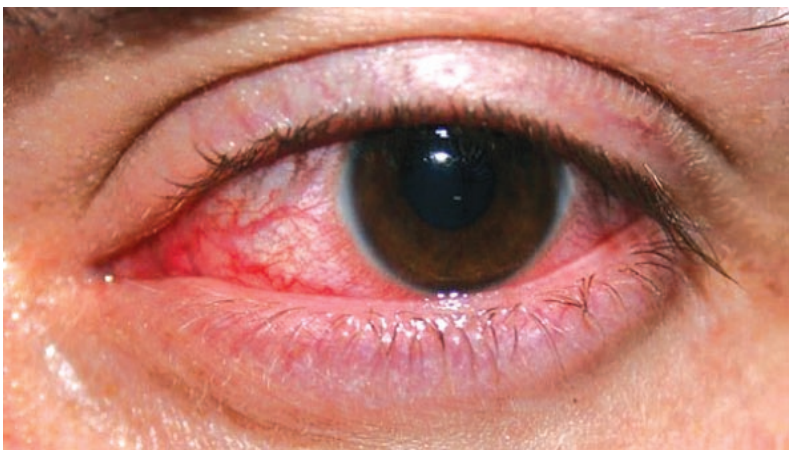

সিনড্রমও (এক ধরনের অটোইমিউন ডিজিজ) চোখের উপরে আঘাত আনতে পারে। ঘুমোনোর সময়ে যাদের চোখ পুরোপুরি বন্ধ হয় না, যেমন স্ট্রোক বা স্নায়ু সমস্যার রোগী, তাঁদেরও চোখে জল শুকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ভিটামিনের অভাবও চোখের জল কমার কারণ হতে পারে। এই সমস্যা অনেকদিন ধরে চললে এবং ঠিক মতো চিকিৎসা না করলে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চোখের শুষ্কতা বোঝার উপায় :

কী করে বুঝবেন, সমস্যাটি আপনার চোখে দানা বেঁধেছে?

- চোখ অনবরত চুলকাতে বা বারবার চোখ রগড়াতে ইচ্ছে হলে।
- চোখ ভারী ভারী মনে হলে।
- চোখ খটখটে শুকনো লাগলে বা চোখে কিছু পড়ছে মনে হলে।
- চোখ লাল হয়ে গেলে বা অবিরাম জল পড়তে থাকলে।
- আলোয় অস্বস্তি হলে কাছের ও দূরের বস্তু দেখতে অসুবিধা হলে।
- কোনও কোনও মাথাব্যথা থেকে জ্বর, এমনকী নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপসর্গ হলে।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলে ড্রাই আইজ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

উপশমের সন্ধান :

চোখের শুষ্কতার চিকিৎসার শুরুতেই কারণ নির্ণয় করা জরুরি। স্কিন টাইম বাড়ার জন্য না কী অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে থাকার ফলে অথবা অন্তর্নিহিত রোগের কারণে— উৎস বুঝে চলতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানালেন 'টিয়ার সিক্রেশন টেস্ট, টিয়ার কোয়ালিটি টেস্ট, টিয়ার ভলিয়ুম অ্যাসেসমেন্ট করে চোখের জল তৈরি হচ্ছে কিনা বা চোখের জল তৈরি হলে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে কিনা-তা জেনেই প্রতিকার হিসাবে কৃত্রিম চোখের জল (আর্টিফিসিয়াল টিয়ার্স) তৈরি করতে হবে। কাবক্সিমিথাইল সেলুলোজ, সোডিয়াম হাইলুরোনেট শুষ্কতা কমানোর সলিউশন হিসাবে খুব ভালো কাজ করে।' এতেও সমস্যা না গেলে আই ড্রপ, অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক।

চোখের শুষ্কতাকে অবহেলা করা উচিত নয়। এটি কর্নিকার ক্ষতি করার পাশাপাশি অন্ধত্বের কারণও হতে পারে। সুস্থ থাকতে গেলে রোগের চিকিৎসাই একমাত্র উপায় নয়। প্রাথমিক শর্ত হলো সচেতনতা। কর্মব্যস্তার মাঝেই সময় বার করুন তাহলে সুন্দর থাকবে চোখ। ভালো থাকবেন আপনিও।

চিকিৎসা :

মায়াজম ও লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে এই সমস্যার সমাধান হয়।

সায়ন্তন জীবন

শেখর সেনগুপ্ত

জনগণনার তথ্য ঘাঁটিয়ে জ্ঞাত হলাম, ৬০ থেকে ১০০ বছরের জীবদ্দশায় অবস্থান করছেন, এই রকম নাগরিকের সংখ্যা ভারতের ১০ কোটি ১৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৫১ জন, যা ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। ২০২৬ সনে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশই হবেন এই প্রবীণরা। এক অর্থে এটা অবশ্য দেশের উন্নয়নেরই পদধ্বনি। মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধির পথে পরিবেশ ক্রমশ উপযোগী হয়ে উঠছে। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারি বদান্যতার সুলভে তাদেরও কাছে লভ্য হতে চলেছে, যাদের ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা যেন চিরায়ত। কাজেই প্রবীণদের দিকে আর নজর দেবার দরকার নেই এবং প্রবীণদের ভোগস্পৃহাও ক্রমবর্ধমান, ঝটিতে এই রকম কোনও সিদ্ধান্তে আসবেন না। বরং আর্থিক ও সামাজিক বিশ্লেষণে বসলে অস্বস্তিকর সংকেতগুলিকেই দেখতে পাই। বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, বয়স্ক মানুষদের ৬৫ শতাংশ তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে অপরের করুণা ও বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্ভরতা অধিকতর নির্মম। তাঁদের মতামতের দাম কম, সংসারে জোর গলায় কিছু বলতে গেলে সেটা নিছক স্পর্ধারূপে গণ্য হয়। কারণটা ঐতিহাসিক। জাতি বহুকাল পরাধীন ছিল। পশ্চিমি সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয়দের যৌথ পরিবারের মূল কবেই উৎপাটিত। মানুষে-মানুষে আজ যে বিচ্ছিন্নতা, তা মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকেও লজ্জা দেবে। এখন বরং হরেক মহোৎসবে সরকারি দাক্ষিণ্যেই অকল্পনীয় মদ্যপ ঘনিষ্ঠতা দেখে রোমাঞ্চিত হবার মৌসম। কম বয়সীদের এমত ব্যাধি বয়স্কদের আরও নিঃসঙ্গ করছে। শহরের কথা না হয় বাদই দিলাম, চাকরির সুবাদে বহু গ্রাম চষে বেড়িয়েও একটি দুটির বেশি যৌথ পরিবারের সন্ধান আমি পাইনি। আত্মিয়স্বজন, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক—এগুলি নিয়ে পারিবারিক তথা বংশগত নথি তৈরি করতে তাঁরা বিলকুল অসমর্থ। রৌদ্রের খরতাপ, শীতের মরণ কামড়, কালবৈশাখীর ভোঁ ভা জলঝড়—কম্পমান বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে যেন দাঁড়াবার মতো মানুষের একান্ত অভাব।

পরিস্থিতির উন্নয়নে বিজেপি সরকার যে যুগপৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সচেষ্ট, তা অনস্বীকার্য। বিশেষত, চিকিৎসাক্ষেত্রে। যে নৈতিকতার দায় স্বীকার করে নিয়ে নরেন্দ্র মোদীজী 'আয়ুষ্মান ভারত'কে বলবৎ করলেন, দৃষ্টান্ত হিসেবে তা অনন্য। আবার এটা অতি অলুক্ষণে বিষয় যে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর 'অনুপ্রেরণা'য় পশ্চিমবঙ্গবাসী ওই প্রকল্পের তাবৎ চিকিৎসাগত সুবিধালাভ থেকে বঞ্চিত থাকলেন। মহল্লায় মহল্লায় আমি অন্যদের পাশাপাশি অনেক মাননীয় বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুনেছি। এটা কেন? রাজনৈতিক প্রলোভনের একটা সীমা থাকবে না? মনে আসে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'Earth provides enough to every body's needs, but every man's greeds also.'

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা অবসর নিয়ে থাকেন ৬০ বছর বয়স পূর্ণ করবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে দেখবেন, এ দেশে ক'টি মাত্র সংস্থা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে অবসরভাতা বা পেনশন দিয়ে থাকে? কর গোনারও বোধ হয় দরকার হবে না। পরিসংখ্যান বলছে, দেশের মোট অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র সাড়ে সাত অংশ বয়স্ক বয়স্কারা পেনশন পেয়ে থাকেন। যাঁদের পেনশন নেই, তাঁদের আপখোরাকির সংস্থান কীভাবে হবে, নিয়োগকর্তাদের নিকট এটা যেন নিতান্তই একটি অবাঞ্ছিত প্রশ্ন। জানি, যাঁদের অবসরভাতা নেই, তাঁরা পি. এফ, গ্রাচুইটি, লিভ এনক্যাশমেন্ট ইত্যাদি মোতাবেক একটা পুষ্ট থোক টাকা পেয়ে থাকেন, —যার সিংহভাগ ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস ইত্যাদি নিরাপদ সংস্থায় স্থায়ী আমানতের রূপ নেয় এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকাতেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির নিবারণ, চিকিৎসা ব্যয়...ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস ইত্যাদিতে আমানতের ওপর প্রদত্ত সুদের হার উত্তরোত্তর যে হারে হ্রাস পাচ্ছে, সুদ নির্ভর এই সমস্ত প্রবীণ নাগরিকরা এখন অভাবের তাড়নায় ও ক্ষোভে প্রতিদিন গর্জন করছেন। একটু কান পাতুন, শুনতে ঠিক পাবেন। বহুজন মান্য নেতা-নেত্রীদের কাছেও এই কানপাতাটা আবশ্যিক হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক দেশে।

আবার পেনশন যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা সকলেই যে খুব বহালতবিয়ত, তা কিন্তু নয়। পেনশন প্রদানে একাধিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কুৎসিত অবিচার নজরে আসে। উদাহরণস্বরূপ টেনে আনছি ভারত তথা বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে। একটি নাতিদীর্ঘ উদাহরণ দিলে আপনাদের ধৈর্য বিঘ্নিত হবে না। আমার বন্ধুস্থানীয় ওই ব্যাঙ্কের একজন প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার চাকুরি থেকে অবসর নেন ২০০০ সনের ৩০ নভেম্বর। সেই বৃদ্ধ বর্তমানে ব্যাঙ্ক থেকে মাসিক পেনসন পান ২৩ হাজার ১৩০ টাকা। আবার ওই একই ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ ক্লার্ক ২০১৯ এর ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নিয়ে মাসিক পেনশন পেতে চলেছেন ৩৯ হাজার টাকা। কেন এই ভয়ানক অবিচার? কারণ ২০০০ সনে কর্মী ও আধিকারিকদের যে পে স্কেল ছিল, এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যিনি অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ, তাঁর দাবি নিয়ে বাগবিতণ্ডা করবার কেউ নেই। যদি থাকেও, কর্তৃপক্ষের বিবেক তাতে সাড়া দেয় না। যথারীতি এই অবিচার গণ্ডগোল চলছে দুরন্ত গতিতেই। একেই কয় আক্কেল গুড়ুম। ■

ভারতের আর্থিক অবস্থা ও বিশেষজ্ঞদের মত

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আই এম এফ) একজন সর্বোচ্চ আধিকারিক জানিয়েছেন যে, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো অপেক্ষা ভারতের ঋণ কম। তিনি সতর্ক করেছেন যে বিশ্বের মোট ঋণ ২০১৭ সালে অত্যধিক বেড়েছে, এক নতুন রেকর্ড মাত্রা ছুঁয়েছে—১৮২ ট্রিলিয়ন ইউ এস ডলার। আই এম এফের রাজস্ব সংক্রান্ত দপ্তরের নির্দেশক ভাইটর গ্যাসপার বলেছেন যে, বিশ্ব জিডিপির তুলনায় শতাংশের হিসাবে বিশ্বের যে মোট ঋণ তার থেকে ভারতের ঋণ অনেক অনেক কম। আই এম এফের থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে ২০১৭ সালে ভারতের বেসরকারি ঋণ ছিল জিডিপির ৫৩.৫ শতাংশ আর সাধারণ সরকারি ঋণ ছিল জিডিপির ৭০.৪ শতাংশ অর্থাৎ জিডিপির প্রায় ১২৫ শতাংশ। এর তুলনায় চীনের ঋণ জিডিপির ২৪৭ শতাংশ। ঋণ জিডিপি অনুপাতের সঙ্গে মাথাপিছু জিডিপির সম্পর্ক আছে। পৃথিবীর উন্নততম দেশ বা উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় ভারতের ঋণের মাত্রা অনেক কম। গ্যাসপার আরও বলেছেন—বিশ্বব্যাপী বেসরকারি ঋণ গত ১০ বছরে সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে, অথচ গত পাঁচ বছরে ভারতের বেসরকারি ঋণ প্রায় ৬০ শতাংশ কমে গেছে। এখন তা কমে হয়েছে ৪৫.৫ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। সুতরাং ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ খুব মজবুত। যেখানে অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো, (ভারতও উন্নয়নশীল দেশ), বেসরকারিভাবে দেনা করে গেছে কিন্তু গত দু'বছরে তাদের অর্থনীতি অনেক মন্থর হয়েছে সে তুলনায় ভারতের ভিত দৃঢ়। সুতরাং ভারত সেইরকম উন্নয়নশীল দেশ নয় যে ধার করা টাকা খাটাচ্ছে ভবিষ্যতে লাভ হবে এই আশায়। গ্যাসপারের মতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি ঋণ সরকারি ঋণের তুলনায় অনেক বেড়েছে। চীনের মোট ঋণ জিডিপির ২৪৭ শতাংশ কিন্তু সেখানে বেসরকারি ঋণ আর সরকারি ঋণের মধ্যেকার ফারাক খুব অস্পষ্ট (কারণ ওরা সব লুকিয়ে রাখে)। এই অস্পষ্টতার কারণ ওখানে অনেক বেশি সংখ্যায় সরকারি সংস্থা ও নিগম আছে, আছে সরকারের জটিল অনেক স্তর আর বিস্তৃত আঞ্চলিক বাজেট বহির্ভূত ধারা। ফলত ২০১৭ বর্ষের সরকারি ঋণের আনুমানিক হিসাব ভীষণভাবে পাল্টাচ্ছে; সরকারিভাবে সরকারের ঋণ জিডিপির ৩৭ শতাংশ আর সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক দেখাচ্ছে তা জিডিপির ৪৭ শতাংশ। আর বাজেটের বাইরে স্থানীয় সরকারগুলো দেনা করেছে জিডিপির ৬৮ শতাংশ।

ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন (আইবিআরডি) মাঝারি ও নিম্ন আয়ের দেশগুলিকে ঋণ দেয় বাজার দরে আর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট অ্যাসোশিয়েশন (আইডিএ) নিম্ন আয়ের দেশগুলিকে প্রায় বিনা সুদে ঋণ দেয়। এই দুটো নিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক। ২০১৫-১৮ ভারত ৬১টা প্রকল্পের জন্য ১৩১ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে (সূত্র গুগল) ১১–১৪ পর্বে ভারত নিয়েছিল ১৩৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ ৬৬টা প্রকল্পের জন্য। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতই ২০১৬ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ ঋণগ্রহীতা। এই সময়ে ০.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ ভারত নিয়েছে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার জন্য। একটা উন্নয়নশীল দেশ যার পরিকাঠামো উন্নতির জন্য খুব চাপ আছে তাকে বিশ্বব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিতেই হয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রধানত পরিবহণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা,

বিদ্যুৎ ইত্যাদি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী দায়িত্বগ্রহণের সময়ে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ভারতের ঋণ ছিল ৫.১১ বিলিয়ন ডলার আর ৩১ জুলাই, ২০১৯-এ তা দাঁড়িয়েছে ৩.২৭ বিলিয়ন ডলার তার অর্থ প্রায় ২ বিলিয়ন ইউ এস ডলার ঋণ অতিরিক্ত শোধ করেছে। জুলাই মাসের তথ্য বলছে আর ছ' মাস বাদে তা হবে মাত্র০.২৫ বিলিয়ন ডলার। সারা বিশ্বের অর্থনীতি একই সময়ে মন্দার মধ্য দিয়ে চলেছে প্রায় সমস্ত বৃহৎ অর্থনীতি গতিবেগ হারিয়েছে। এই মন্দার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ বৃহত্তম দুটি অর্থনীতির মধ্যে জারি বাণিজ্য সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের দুটো ফলশ্রুতি—উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের আয়তন হ্রাস আর দেশগুলোর মধ্যে সবসময়ে শুল্ক বৃদ্ধির ভয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ভারতের ফলাফল ততটা হতাশব্যঞ্জক নয়। ভারতের রপ্তানি ৬.৫৭% কম হয়েছে ২৬ বিলিয়ন ডলার আর আমদানি ১৩.৯% কমে হয়েছে ৩৬.৯ বিলিয়ন ডলার। তা সত্ত্বেও আই এম এফ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে যে পরবর্তী আর্থিক বছরে ভারতের বৃদ্ধির মাত্রা বাড়বে। সম্প্রতি ভারত সরকার কর্পোরেট কর কমিয়ে ভালো কাজ করেছে কারণ এতে শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে। (টিওআই, ১৮/১০/১৯) বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার ২০১৪ সালে ছিল ৩০৪ বিলিয়ন ডলার আর ২০১৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪২০ বিলয়ন ডলার। মুদ্রাস্ফীতির হার ৩-৪এর মধ্যে আছে যা ২০১৩ সালে হয়েছিল ১৩.৮। ২০১৩ সালে লিটার প্রতি পেট্রলের দাম ছিল ৮৩.৮৪ টাকা আর এখন তা ৭৫.৯২ টাকা লিটার। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যথেষ্ট বাড়া সত্ত্বেও। ২০১৪-১৯-র মধ্যে গড় দাম ছিল ৭০ টাকা প্রতি লিটার। ভারত ইরানের ৪৩০০০ হাজার কোটি টাকার অপরিশোধিত তেলের দাম মিটিয়ে দিচ্ছে দু'মাসের মধ্যে।

ভারত এখন পৃথিবীর চতুর্থ গাড়ি প্রস্তুতকারক দেশ আর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশ। দু-চাকার গাড়ি উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে এক নম্বর। আর বিক্রিত মোবাইলের ৯৪% এখানে প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল উৎপাদনকারী দেশ ভারত। ইজ অব ডুইং বিজনেসে ২০১৪ সালে ১৩৪ নম্বর স্থানে ছিল ভারত এখন উঠে এসেছে ৭৭ নম্বর স্থানে। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৫৭ বছরে যেখান ৯১,২৮৭ কিমি রাস্তা নির্মাণ হয়েছে সেখানে মোদীর আমলে ৪০,০৩৯ কিমি. রাস্তা নির্মাণ হয়েছে মাত্র ৪ বছরে ২০১৪—১৮-র মধ্যে কাজ চলছে। ৩৪টা নতুন বিমানবন্দর চালু হয়েছে। আড়াই লাখ পায়খানা নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। রেলের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। সৌরশক্তিচালিত ট্রেন চালিত হয়েছে। ১০টি দ্রুতগতিসম্পন্ন রেল করিডর নির্মাণের কাজ চলছে। তেজস, গতিমান আর বন্দের মতো দ্রুতগতির ট্রেন প্রস্তুত হয়েছে। ৮৭১ টা নতুন ট্রেন সার্ভিস-সহ ১৮০টা নতুন রেললাইন তৈরি হয়েছে। সামান্য কিছু উন্নয়নের কাজ উল্লেখ করলাম। সদ্য স্মারক নোবেলপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ পুরস্কার ঘোষণার অব্যবহিত পরে বললেন ভারতের আর্থিক অবস্থার হাল খুব খারাপ। তেমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কথা এখন ভারতবর্ষের মানুষ জেনে গেছেন। তিনি সুপারিশ করেছেন সাম্প্রতিক কর্পোরেট কর হ্রাসের সিদ্ধান্তকে উল্টে দিয়ে বেশি করে কর চাপাতে, সেই সঞ্চিত অর্থ পি এম কিষাণ ও নরেগা প্রকল্পে ঢালতে হবে। এটা ভাবতে কষ্ট হয় যে এই ভয়াবহ বিশ্বব্যাপী মন্দার দিনে যে বামপন্থী আর্থিক তত্ত্ব সারা পৃথিবীতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে তার সুপারিশ কেউ করতে পারে। আমাদের অর্থনীতিবিদরা তাঁদের ছাত্রাবস্থায় যে ব্যর্থ অর্থনৈতিক তত্ত্ব একবার মাথায় ঢুকেছে তা ভুলতে পারেন না। এটা মানুষকে স্বীকার করতেই হবে যে সমস্ত কমিউনিস্ট দেশগুলো বরবাদ হয়ে গেছে তাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কারণে। ব্যতিক্রম চীন, যে দেশ কিনা অনুসরণ করছে পুঁজিবাদী-ফ্যাসিস্ট-কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী এক বিপজ্জনক পন্থা। শিল্প বিপন্ন। তার জন্য ভারত দায়ী নয় তা আগেই বলা হয়েছে।

গাড়ি শিল্পে মন্দার অনেক কারণ আছে—কালোটাকার উপর নিয়ন্ত্রণ, বাজারে প্রচুর ভালো পুরনো গাড়ির যোগান, বৈদ্যুতিক গাড়ির উপর জোর দেওয়া ইত্যাদি। শিল্পই কাজ বা চাকরি সৃষ্টি করে তাদের মদত দেওয়া দরকার। শিল্প ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে যারা চাকরি সৃষ্টি করে তাদের ঋণের উপর সুদ কমাতে হবে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে সহায়তা বাড়ানো যেতে পারে অন্য উপায়ে, শিল্পকে মেরে নয়। যুগের দাবি এটাই। নেহরু মডেলকে ফিরিয়ে আনার কোনো মানে হয় না। তিনি গরিবের হাতে টাকা দিতে সুপারিশ করেছেন ('ন্যায়'-এর মতো প্রকল্প)। প্রথমত টাকা আসবে কীভাবে? উনি যে পথ বাতলেছেন তা শুরুতেই বাতিলযোগ্য। দ্বিতীয়ত, এতে কোনো স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, যে দেশে যোগ্য গ্রহীতার চয়ন সন্দেহজনক, টাকাটা কোথায় পৌঁছবে শেষাবধি, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল।

ত্রিপুরার প্রতি মুজিবকন্যার অনুভূতি ন্যায়সঙ্গত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক গত পাঁচ দশকের মধ্যে এখন সর্বোচ্চ মাত্রা লাভ করেছে। দুদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। তবে একটা বিষয় দুদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে এসেছে যে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতদিন মূল 'নজর' ছিল পশ্চিমবঙ্গে। দু'দেশের মধ্যে প্রথম বাস সার্ভিস চালু হয়েছিল ঢাকা-কলকাতার মধ্যে। এখন সরাসরি ট্রেন চলছে। দুদেশের মানুষের যাতায়াতও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পথে সবচেয়ে বেশি। গত বছরও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতীতে গিয়ে 'বাংলাদেশ ভবন'-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানও ঐতিহ্যগতভাবে বেশি। তবে তিস্তা নিয়ে টানাপোড়েন আছে। বলা হচ্ছে আলোচনা চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লি ও ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গের বদলে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের 'নজর' এখন ধীরে ধীরে ত্রিপুরার দিকে সরে যাচ্ছে। তাদের এ বক্তব্যের পক্ষে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দেওয়া দুটি বক্তব্যের কথা বলছেন।

দিল্লি সফরশেষে ঢাকা ফিরে গত ৯ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ত্রিপুরা যদি কিছু চায় তাহলে তা আমাদের দিতেই হবে। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশের মানুষ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের বড় ঘাঁটি ছিল ত্রিপুরা, তারা ছিল আমাদের বড় শক্তি। ভারতকে ফেনী নদীর জল দেওয়া নিয়ে বাংলাদেশে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। জল দেওয়ার পাশাপাশি কথা উঠেছে ত্রিপুরায় এলপিজি রপ্তানি এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার নিয়েও। শেখ হাসিনার এবারের দিল্লি সফরে লাভবান হয়েছে ত্রিপুরা।

গত ৫ অক্টোবর বিপ্লব দেব টুইট করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উভয় দেশই উন্নতির শিখরে পৌঁছুবে। আপনাদের মধ্যে হওয়া আজকের বৈঠকের ফলে সর্বাধিক সুফল পাবে ত্রিপুরা। আমি ৩৭ লাখ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ দুই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফর থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সম্পর্ক আলাদা উচ্চতায় পৌঁছেছে। এলপিজি রপ্তানি, ফেনী নদীর জল কিংবা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের এসওপি-সহ দুই দেশের মধ্যে যেসব সমঝোতা হয়েছে, হাসিনার এবারের দিল্লি সফরে ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুফল পাচ্ছে ত্রিপুরাই। শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক দিল্লি সফরের সময় ঘটা বেশ কিছু ঘটনার কথাও বলছেন বিশ্লেষকরা।

এক, শেখ হাসিনা যেদিন দিল্লিতে পা রাখেন (৩ অক্টোবর), সেদিন রাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের দেওয়া নৈশভোজে দুজনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অথচ শেখ হাসিনার এবারের সফরে আরেক সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে দেখাই যায়নি। দুই, শেখ হাসিনা ও বিপ্লব দেবের মধ্যে আলোচনায় ঢাকা-আগরতলা সরাসরি বিমান চলাচল নিয়ে পর্যন্ত কথাবার্তা হয়েছে। যদিও দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ১৩০ কিলোমিটার। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এখন সপ্তাহে ৬১টি ফ্লাইট চলে। আগামী বছরের মধ্যে তা দ্বিগুণ করার কথা বলা হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। নতুন ফ্লাইটগুলোর

বেশিরভাগই চলবে আগরতলা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে। তিন, তিস্তা চুক্তির জটিলতা না কাটলেও বাংলাদেশ ফেনী নদী থেকে ত্রিপুরার সাব্রুম শহরকে পানীয় জল দিতে রাজি হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এর মাধ্যমে ঢাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও পরিষ্কার বার্তা দিতে চেয়েছে। চার, তিস্তা চুক্তি যখন প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাধাতেই আটকে আছে, তখন ফেনীসহ আরও ৭টি অভিন্ন নদীর জলসম্পদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে দুই দেশই একমত হয়েছে। মনু, মুহুরি, খোয়াই, গোমতীর মতো নদীগুলোর অধিকাংশই বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। পাঁচ, বাংলাদেশ থেকে যে বাল্ক এলপিজি আমদানি করে ত্রিপুরার বিশালগড়ে সিলিন্ডারজাত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটাও হয়েছে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে রান্নার গ্যাস জোগানের কথা মাথায় রেখে। ছয়, চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিয়োর নির্ধারিত হয়েছে, তার সুফলও সবচেয়ে বেশি পাবে ত্রিপুরা ও মিজোরাম। এখানেও ত্রিপুরাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দর বাংলাদেশকে ব্যবহার করার প্রস্তাব নিয়ে তেমন কোনও অগ্রগতি হয়নি।

দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের প্রধান অধ্যাপক সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলেন, সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের ফ্রেমওয়ার্কে ত্রিপুরাই যেন এখন নতুন পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে উঠে আসছে। তিনি বলেন, বন্ধুপ্রতিম একটা দেশের সঙ্গে ভারতের একটি সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্যের সম্পর্ক আসলে ঠিক কেমন হওয়া উচিত ত্রিপুরাকেই যেন তার রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে। এবং পশ্চিমবঙ্গকে দেখিয়ে নীরবে বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত।

প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীরজা চৌধুরী এর সঙ্গেই যোগ করছেন, বছর দেড়েক আগে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সচেতনভাবে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অসমেও বিজেপির সরকার আছে। তবে এনআরসি-র কারণে যেহেতু অসম সম্পর্কে বাংলাদেশের কিছুটা অস্বস্তি আছে, তাই এখানে সচেতনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরাকেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, উল্টোদিকে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা তারা পাচ্ছে না, এর মাধ্যমে সেটাও বোঝাতে পারছে। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তখন হয়তো ছবিটা পাল্টাতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশে দুদেশের সম্পর্ক নিয়ে যারা আলোচনা করেন তাদের কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরার সাব্রুমের মানুষের জন্যে ফেনী নদীর জল দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছেন, তিস্তার জল না পেলেও বাংলাদেশের আন্তরিকতার অভাব নেই। তিনি ৯ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেনও, সাব্রুমের মানুষের পানীয় জলের কষ্ট আছে, আমরা বুঝি। তাই জল দিতে আপত্তি করিনি। এই সাব্রুম তো একাত্তরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রবল চাপ সামলেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদেরও বড় ঘাঁটি ছিল সাব্রুমে।

বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ত্রিপুরার স্থান অবিস্মরণীয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে কথিত মামলায় বাংলাদেশের জাতির জনককে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়ার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল পাকিস্তানি সামরিক সরকার, ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে তা ভেস্তে যায়। মামলা প্রত্যাহার করে মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। তবে এটা ঠিক, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে যখন ভাবতে শুরু করলেন, তিনি তখনই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান ভারতের সাহায্য ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। তিনি আগরতলায় গিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে মুজিবকন্যার ত্রিপুরার প্রতি একটা আলাদা অনুভূতি থাকবে বলাই বাহুল্য। কিছুদিন আগে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে ভারী যন্ত্রপাতি নদীপথে আশুগঞ্জ হয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করতে হয়। ■

সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা শাখার বর্ষিক কলা উৎসব উদ্‌যাপন

সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা শাখার বার্ষিক কলা উৎসবের আয়োজন করা হয় গত ২০ অক্টেবর মানিকতলার রামমোহন হলে। বিজয়া -দীপাবলী উপলক্ষ্যে পারিবারিক সম্মেলনের এই

অনুষ্ঠানে দেবী দুর্গা ও নটরাজের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, প্রদীপ প্রজ্বলন সমবেত দীপমন্ত্র, শান্তিমন্ত্র পাঠ ও ভাব সংগীতের মাধ্যমে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি বিশিষ্ট বাগ্মী ও শিক্ষাবিদ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এবং বিশিষ্ট যোগ শিক্ষক ড. অভিজিৎ ঘোষ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক পদ্মশ্রী বিষ্ণু শ্রীধর ওয়াকনকরের শতবর্ষে পদার্পণে তাঁর কর্মকাণ্ড নির্ভর একটি তথ্য আলেখ্য --- মধ্যভারতের সুপ্রসিদ্ধ গুহাচিত্র ভীমবেটকার পুনরাবিষ্কার এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন সরস্বতী নদীর গতিপথ চিহ্নিতকরণ পরিবেশন করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী ঋতুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য আলেখ্যটি নির্মাণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষভাগে 'নমামি গঙ্গে' নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করা হয়। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন রাজরূপা দেব ও বিশিষ্ট গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী সৌম্য ভৌমিক। নৃত্য সহযোগিতায় ছিল দক্ষিণেশ্বর শিশু কিশোর মঞ্চ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত নির্দেশক প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রদেশের সহ সভাপতি গুরু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, গোপাল কুণ্ডু, তিলক সেনগুপ্ত, প্রবীর ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রমুখ।

কলকাতার অসোয়াল ভবনে জুগলকিশোর জৈথলিয়া স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় অসোয়াল ভবনের সভাকক্ষে কর্মযোগী জুগলকিশোর জৈথলিয়া স্মৃতি ব্যাখ্যানমালার চতুর্থ পর্বের আয়োজন করা হয়। ব্যাখ্যানমালার বিষয় ছিল 'হিন্দি এবং রাজস্থানি সাহিত্যের অন্তঃসম্বন্ধ'। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লখনউয়ের বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক প্রফেসর সূর্যপ্রকাশ দীক্ষিত। তিনি বলেন, লোকসাহিত্যে রাজস্থানি ভাষার বড়ো অবদান রয়েছে। হিন্দি কবিতার মধ্যে যে শৌর্যভাব রয়েছে তা রাজস্থানি ভাষারই দান। হিন্দি সাহিত্যে রাজস্থানি ভাষার প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা রাজস্থানি

ও হিন্দি সাহিত্যের ওজস্বী কবি ড.গজাদান চারণ 'শক্তিসুত' বলেন, রাজস্থানি স্বাভিমানের ভাষা, ওজ প্রধান ভাষা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র শ্রীরাম বন্দনা পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাড়া দৃগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সাহিত্য সচিব বংশীধর শর্মা।

বর্ধমানের শ্রীপাট জাজিগ্রামে ধর্মসভা

গত ২৩,২৪,২৫ আগস্ট বর্ধমান জেলার শ্রীপাট জাজিগ্রামে গিরিজা দাস ও পূর্ণেন্দু দত্তের উদ্যোগে এর ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় প্রবচন রাখেন খড়্গপুরের শ্রীরামনাম সঙ্ঘ। তিনদিন ব্যাপী এই ধর্মসভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীকৃষ্ণের নাম মাহাত্ম্য প্রচন ও গানের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়। বক্তব্য রাখেন শ্রীশ্রী সাধুবাবা। প্রচুর লোকসমাগম হয়। সহযোগিতা করে জাজিগ্রাম পাটবাড়ি।

নিবেদিতা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

গত ২৫ অক্টোবর উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে সিস্টার নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা এবং নিবেদিতা সম্মান ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এবং বিশেষ অতিথি রূপে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা ড.অনির্বাণ গাঙ্গুলি। নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট গবেষক ড. পূর্বা সেনগুপ্ত। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ্বের মধ্যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ভারত শ্রেষ্ঠ। আর ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বঙ্গভূমি। বঙ্গভূমির অবদানের কথা কখনই বিস্মৃত হবার নয়।' রাজ্যপাল আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি জানতে তিনি আগ্রহী। রাজ্যপাল হয়ে আসার পর তিনি ইতিমধ্যে এখানকার সংস্কৃতি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে ড. গাঙ্গুলি বলেন, ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনার ওপর জোর দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সে কাজ অবিলম্বে শুরু হওয়া দরকার। পূর্বা সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে এবছরের নিবেদিতা সম্মান প্রদান করা হয় পরিবার গোষ্ঠীকে। এছাড়া ৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে একনাথ রানাডে ক্রিয়েটিভ রাইটিং অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। সদানন্দ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় স্কুলছাত্র লবকুশ শুক্লাকে। বন্দে মাতরম্ রাষ্ট্রগীত পরিবেশন করেন ভরত কুণ্ডু।

রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে নতুন রাজ্যপাল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে এবং বৃহত্তর কলকাতার ৪০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠিত নাগরিক পরিষদ ও অন্য সামাজিক, সাহিত্যিক, সেবা সংস্থার সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বেণুগোপাল বাংগড় এবং বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাড়োয়ারি ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সন্তোষ সরাফ এবং অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের মুখ্য সংরক্ষক জয়প্রকাশ সিংহ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট গায়ক সত্যনারায়ণ তিয়াড়ী 'মরুধর অম্হারো দেশ' গীত পরিবেশন করেন। মহামহিম রাজ্যপালকে মালা, শাল, উত্তরীয়, পাগড়ি ও স্মৃতি চিহ্ন প্রদান করে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ ভাবে রাজস্থান পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমতী অলকা কাকড়া তিলক পরিয়ে, শাদূলসিংহ জৈন মাল্যার্পণ করে, বেণুগোপাল বাংগড় শাল পরিয়ে এবং পরিষদের পদাধিকারীরা অভিনন্দনপত্র প্রদান করে সম্মানিত করেন। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন বংশীধর শর্মা। সংবর্ধনার উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, 'রাজস্থানের তথা হিন্দিভাষী মানুষ পৃথিবীর যেখানেই যান,সেখানেই তাঁরা কর্মদক্ষতার পরিচয় রাখেন। পরিশ্রমের দ্বারা তাঁরা সেখানকার সমাজকে সমৃদ্ধ করেন।' সংবর্ধনায় অভিভূত রাজ্যপাল বলেন, 'আপনারা আমাকে যে সম্মান জানালেন তাতে আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। আপনাদের আমি কথা দিচ্ছি, আমি আমার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবো।' অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের উপাধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণ প্রকাশ মল্লাবত।

হাওড়ায় উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১০ অক্টোবর হাওড়ার ধাড়সায় ইউনিভার্সাল ইন্ডিয়া লিটাগোচর পোর্টের উদ্যোগে ভারত মনীষী উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাশের জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশ্বমঞ্চ কবিতার রূপকার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধক, মৈত্রী শান্তির বার্তাবাহক চিরু মহাশয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, সাহিত্যসেবী ও ভারত সংস্কৃতি ঐতিহ্য গবেষক অসিত কুমার সিংহ। এছাড়া ড. রনিতা রায়চৌধুরী, ড. চন্দ্রনাথ শইকিয়া, ড. গোপাল মুখার্জি, ড. অনামিকা রায়বর্মন, ড. এস এস মণিরত্নম, আদিত্যন শাস্ত্রী অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ, ড. বি টি এস পিলালাই প্রমখ উপস্থিত ছিলেন। সমাজ পত্রিকার শতবার্ষিকীর শুভ কামনায় একশোটি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবির

পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য সমাজসেবী সংস্থা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে গত ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতার বড়বাজার লোহিয়া ক্লাব কুমারটুলিতে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। এদিন ৮০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৫৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর বেহালার ১২৪ নং ওয়ার্ডে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় শাখা ও ভারতীয় জনতা পার্টির ওয়ার্ড কমিটির সহযোতিায় চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১১৯ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৮৮ জনকে চশমা দেওয়া হয় এবং ৫৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ৭ জনের ইসিজি করা হয়।

২২ সেপ্টেম্বর মালদহ জেলার দেবোত্তরপুর গ্রামে স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতায় চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৯৮ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৬৮ জনকে চশমা দেওয়া হয় এবং ১৬০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার মুদিয়ালীতে মা তারা ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয়। শিবিরের সূচনা করেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দৈতাপতি রাজেশ দৈতাপতি। শিবিরে ৭৭ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৬৭ জনকে চশমা দেওয়া হয়।

সোনারপুরে শিক্ষক সঙ্ঘের গুরু বন্দন অনুষ্ঠান

গত ১৮ আগস্ট বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর সানাই ভবনে গুরু বন্দন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জয়ন্ত কুমার রায়চৌধুরী ও বিভাগ কার্যবাহ সুকুমার নস্কর। অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয় ঘাসিয়াড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও লেখক রণজিৎ মণ্ডল এবং শীতলা মদন শঙ্কর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রঙ্গলাল মণ্ডলকে। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রদেশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দাস, প্রদেশ সমিতির কোষাধ্যক্ষ জগদানন্দ নস্কর, বঙ্গীয় নব উন্মেষ ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক সুজিত মাল প্রমুখ। গুরু বন্দনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ড. রায়চৌধুরী এবং আলোক চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রদেশ সমিতির সদস্য সৈকত মণ্ডল।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইসস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজের আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণ করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ কলকাতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর ফ্রিডম স্ট্রাগল অ্যান্ড ডায়াসপোরা স্টাডিজের অধিকর্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কপিল কুমার। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের শুরুতে সংস্থার পরিচালক ড. মুন্দায়াত শশীকুমার উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অসমের প্রায় হারিয়ে যাওয়া যাযাবরদের ওপর ড.সুজাতা দত্ত হাজারিকার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। ড. দত্ত হাজারিকা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে একনিষ্ঠ নেতাজী গবেষক কপিল কুমার ১৯৪৩ থেকে ৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহাসন্ধিক্ষণে নেতাজীর বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেন। পৃথিবীতে প্রথম মহিলা সেনাবাহিনী তৈরি করার বিরল গৌরবের অধিকারী হিসেবে তিনি নেতাজীর উল্লেখ করেন। জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ-- এই ছিল এদিনের আলোচনার শীর্ষ বিষয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মিত্রশক্তি আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ যে প্রথাগত আত্মসমর্পণ করেনি এই চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেন অধ্যাপক কুমার। আজাদ হিন্দ সরকারকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বসবাসকারী ভারতীয়রা যে বিপুল স্বর্ণালংকার ও অর্থ প্রদান করেছিল তার শেষ পরিণতি নিয়ে তিনি অনুসন্ধান চালাচ্ছেন বলে জানান। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মঞ্চস্থ অতিথিবর্গ।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক ভাইফোঁটা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মহালয়া থেকে সূচনা হয় যে উৎসবের বস্তুত তার সমাপ্তি দেওয়ালিতে কার্তিক মাসের অমানিশায় মহাকালীর পূজার শেষে শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে। বঙ্গজীবনে যত পূজা অনুষ্ঠান যা উৎসব আছে, তার মধ্যে অনন্য এই ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটা দৃঢ় করে সবরকম পারিবারিক বন্ধনকে। সমাজ জীবনকেও দেখায় এক নতুন দিশা। ভাইফোঁটা শাশ্বত এক মধুর সম্পর্কের প্রতীক।

শুধু বঙ্গদেশ নয়, সারা ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল প্রভৃতি দেশেও পালিত হয় ভাইফোঁটা। অঞ্চল ভেদে এই অনুষ্ঠানের নাম ভিন্ন হলেও সব জায়গাতেই এর মূল লক্ষ্য এক। এর মধ্য দিয়েই অস্তিত্বের শিকড় যেন হয় বহু শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত। সেই সঙ্গে একটি সম্পর্ক সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নব নব প্রাণরসে।

বঙ্গদেশে যে অনুষ্ঠানের চলতি নাম ভাইফোঁটা, সাধু ভাষায় তাকেই বলা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। দক্ষিণ ভারতে এটি বিশেষভাবে পরিচিত যম-দ্বিতীয়া নামে। উত্তর ভারতে দিনটি পালিত হয় ভাইদুজ হিসেবে। মহারাষ্ট্রে দিনটিকে বলা হয় ভাউবীজ বা ভাববীজ। নেপালে উৎসবটির নাম ভাইটিকা। এমনি সব নামাবলিতে আবরিত এই অনুষ্ঠানটির অন্তরবীণা বাজে একই সুরে।

ভাই আর বোন। এই শব্দবন্ধের উদ্ভাসে প্রোজ্জ্বল যে সম্পর্ক, সবকিছুর বিচারে তা অতুলনীয়। একই গর্ভ সম্ভব সহোদর-সহোদরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এমন এক আত্মিক বন্ধনে যুক্ত— সেখানে মুহূর্তের স্বার্থের মলিনতাও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না। ফল্গুধারার মতেই স্নেহ ভালোবাসা এবং এক ধরনের অনুভব সবসময়ই

ক্রিয়াশীল এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

পরিবার বা সমাজ গঠনের স্বাভাবিক নিয়মেই মেয়েদের সব ছেড়ে যেতে হয় পতিগৃহে। সাময়িক ভাবে ভাই-বোনের মধ্যে নেমে আসে অদর্শনের যবনিকা। কিন্তু পিতৃগৃহে ছেড়ে আসা ভাই বা দাদাদের ভুলতে পারে না বোনেরা কোনো সময়েই। সেই না ভোলার সূত্রেই শারদীয়ার রেশ ধরেই হেমন্তের শুরুতে আয়োজন করা হয় ভাইফোঁটার। দাদা বা ভাইদের মঙ্গল বা কল্যাণ কামনায় বোন বা দিদিদের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ নেই কোনো পূজা বা যাগযজ্ঞের। এতে দরকার পড়ে না কোনো পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের। সম্পূর্ণ ঘরোয়া বা পারিবারিক এই অনুষ্ঠানে সব বর্ণের বোনেরাই আন্তরিক স্নেহ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় ভাই বা দাদার কপালে ঘি-চন্দন-কাজলের ফোঁটা বা তিলক দেন নিজেরাই একটি মন্ত্র পড়ে। এ মন্ত্র পুরোটাই বাংলায় অনেকটা ছড়ার মতোই। কপালে ফোঁটা দিয়ে কোথাও কোথাও প্রদীপের আলোয় বরণ করা হয় ভাইকে। ছোটো ভাই বা দাদাদের দীর্ঘ জীবন কামনায় মেয়েলি ব্রতের ধারায় সাধারণত একটি ছড়া কাটা হয়। দেশ বা জেলা ভেদে এ ছড়ার দু-একটি শব্দে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তবে সব মন্ত্র বা ছড়ারই সুর এক। সবগুলিতেই ভাইদের নিরাপদ, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেন বোনেরো। ভাইরাও ধান দুর্বা দিয়ে প্রণাম বা

আশীর্বাদ করে প্রতিবচনে প্রার্থনা করেন বোনেদের সুখ-শান্তি-দীর্ঘজীবন। ভাইফোঁটার প্রজ্বলিত মন্ত্র বা ছড়াটি হলো—

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
আজ থেকে ভাই আমার
যম দুয়ারে নিম তিতা।
যমুনা দেয় যমরে ফোঁটা,
আমরা দিই ভাইরে ফোঁটা
স্বর্গে হুলুস্থুল মর্ত্যে ফুল
আজ থেকে ভাই আমার না যাইও দূর।

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় হয় ভাইফোঁটা। কোথাও কোথাও অবশ্য প্রতিপদেও ফোঁটা দেওয়ার রীতি আছে। দ্বিতীয়ার সময়-কাল জানা ছাড়া এক্ষেত্রে পঞ্জিকা বা পুঁথির কোনো ভূমিকা নেই। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও শনি বা মঙ্গলবারে ফোঁটা দেওয়া হয় না। স্থানীয় লোকাচারে শনি বা মঙ্গলবারকে বলা হয় খর বার। তাই ওই দিন দুটিতে কোনো শুভকাজ, প্রতিমা বিসর্জন প্রভৃতি কোনো কাজ করা হয় না। অবশ্য অন্যরা বলেন, কার্তিকের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিটি ভাইয়ের মঙ্গল কামনার জন্য প্রশস্ত। তাই বার যাই হোক, ফোঁটা ওই দিনই দেওয়া কর্তব্য। ভাই দূরে থাকলে বা আসতে না পারলে বহু জায়গাতেই দেওয়াল বা খুঁটিতে ফোঁটা দিয়ে প্রার্থনা করা হয় ভাইয়ের মঙ্গল।

আদিতে যা ছিল সম্পূর্ণভাবেই ঘরোয়া পারিবারিক অনুষ্ঠান, কালে তারও ঘটে সংস্কৃতায়ন। দিনটিকে চিহ্নিত করা হয় যম বা চিত্রগুপ্তর পূজার দিন হিসেবে। আর সেই সূত্রেই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরাও যুক্ত হন এই অনুষ্ঠানে। এখন ফোঁটা দেওয়ার মন্ত্রটিরও দেখা দেয় সংস্কৃত রূপ। ছড়ার মূল ভাবটি বজায় রেখেই রচিত হয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রটি। সেই মন্ত্রটি হলো— 'ভ্রাতস্তব ললাটে হি দদামি তিলকং শুভম্। অতঃপরং যমদ্বারে ময়া দত্তং হি কণ্টকম্।'

একই ভাবে ভাইকে খাওয়ানোর জন্য পাটপাতা ভাজা-সহ যে ঘি-ভাত দেওয়া হয়, সেটি কোথাও কোথাও অমন্ত্রক আবার কোথাও বলা হয়,— 'ভ্রাতস্তবানুজাতহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভং। প্রীতায় যম রাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ। দিদিরা 'ভ্রাতস্তবানুজাতাহং'-এর পরিবর্তে 'ভ্রাতস্তবাগ্রজাত' শব্দটি ব্যবহার করেন।

সম্পূর্ণ ভাবেই একটি পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ভাইফোঁটার উৎস হিসেবে দুটি পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ করা হয়। একটি কাহিনির সঙ্গে যুক্ত মৃত্যুর দেবত যম ও তাঁরই যমজ বোন যমুনা এবং অন্যটিতে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বোন সুভদ্রা।

সূর্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞার। স্বামীর প্রচণ্ড তেজ ক্রমেই সংজ্ঞার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। সূর্যতেজে ঝলসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দূরে দূরেই থাকতেন সংজ্ঞা। যমজ সন্তান যম এবং যমুনার জন্মের পর তিনি আর থাকতে পারলেন না। নিজেরই অনুরূপ ছায়াকে সূর্যগৃহে রেখে আত্মগোপন করেন সংজ্ঞা। যাওয়ার আগে ছেলে-মেয়ে দুটিকে কোনোরকম অযত্ন না করার নির্দেশ দেন ছায়াকে।

দিন যায়। ক্রমে বিমাতার রূপ নিতে থাকেন ছায়া। নির্যাতন করতে থাকেন যম-যমুনাকে। শেষে নিজের সন্তান জন্মাবার পর তিনি সূর্যকে দিয়ে বিতাড়িত করেন যম ও যমুনাকে।

বিতাড়িত যম হন মৃত্যুর দেবতা— আর যমুনা ক্ষোভে দুঃখে নদী হয়ে বইতে থাকেন মর্ত্যে।

দিন যায়। বোনের জন্য মন কেমন করতে থাকে যমের। শেষে তিনি একদিন চলে আসেন যমুনার বাড়িতে। সেটা ছিল দেওয়ালির দুদিন পরের ঘটনা। দেওয়ালির জন্য ঘরদোর সাজানোই ছিল। ভাইকে পেয়ে আনন্দিত যমুনা তাকে বরণ করে কপালে টিকা পরিয়ে দেন মঙ্গল কামনা করে। খাওয়ান বেশ যত্ন করে।

যমুনার এইভাবে বরণ ও ফোঁটা দেওয়ার ঘটনা থেকেই উদ্ভব হয় ভাই ফোঁটার— এমনই বলে থাকেন পৌরাণিকরা।

দ্বিতীয় কাহিনি, নরকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন। মন ভালো করার জন্য তিনি তাই তাঁর বোন সুভদ্রার বাড়িতে যান।

বহুদিন পরে দাদাকে আসতে দেখে সুভদ্রা ভারী খুশি। তাড়াতাড়ি দাদাকে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসেন। কপালে এঁকে দেন তিলক। কোনোরকম অমঙ্গল যাতে তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে তারই জন্য দাদার কপালে ওই ফোঁটা দেন তিনি। তারপর দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়া এবং গল্পে মেতে ওঠেন।

নরকাসুরকে হত্যা করে শ্রীকৃষ্ণের বোনের বাড়িতে আসার দিনটি ছিল কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বোন সুভদ্রার এই ফোঁটা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই চালু হয় এই ভ্রাতৃদ্বিতীয় বা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান।

এই সংসারে ভাই-বোনের সম্পর্ক হলো সবচেয়ে মধুর। সেই মধুরতার স্বাদ নিতেই আয়োজন করা হয় ভাইফোঁটার। আর সে কারণেই কোনোরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান না করেও ভাইফোঁটার দিনটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকেন সব ভাই ও বোন। শুধু আপন ভাই নয়, সমস্ত তুতো-ভাই এমনকী পাড়াতুতো ভাই-দাদাদের ফোঁটা দেন বোনেরা। আর এর মধ্যে দিয়েই বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সৌভ্রাতৃত্বের এক সুমহান আদর্শ তুলে ধরা হয় সকলের সামনে। ভাইফোঁটা তাই সমাজ ও পারিবারিক জীবনের এক অতি স্মরণীয় ও বরণীয় দিন।

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

বউবাজার নৃত্য ভবনের ঐতিহ্যপূর্ণ জগদ্ধাত্রী পুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

মধ্য কলকাতার বউবাজার এলাকায় মুচিপাড়া থানার ১০ নম্বর বাবুরাম শীল লেনের নৃত্য ভবনের (দত্ত পরিবার) জগদ্ধাত্রী পুজো কলকাতার বনেদি বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দত্ত পরিবারে জগদ্ধাত্রী পুজো কবে শুরু হয়েছিল, সঠিক জানা না গেলেও পুজোর বয়স যে সার্ধ শতাধিক বছর অতিক্রান্ত, সেই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কেননা বর্তমান প্রজন্ম পাঁচ পুরুষ ধরে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করে আসছেন।

এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাস জানতে হাজির হয়েছিলাম দত্ত পরিবারের প্রবীণতম সদস্য ৯৫ বছর বয়সি কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে। আলাপচারিতায় শ্রদ্ধেয় দত্ত জানালেন,দত্ত পরিবারে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূত্রপাত করেন পরিবারের আদিপুরুষ বলাইচাঁদ দত্ত। প্রথম কয়েক বছর পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩ নম্বর বাবুরাম শীল লেনের বাড়িতে। বলাইচাঁদ দত্ত-র পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নৃত্যলাল দত্ত জগদ্ধাত্রী পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অদূরে ১০ নম্বর বাবুরাম শীল লেনে তিন খিলানের ঠাকুরদালান-সহ বিশাল অট্টালিকা তৈরি করে পুজো সেখানে স্থানান্তরিত করেন। সেও দেড় শতাধিক বছর আগের কথা। তদবধি ওই বাসভবনে জগদ্ধাত্রী পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৃত্যলালের নামাঙ্কিত এই বাসভবন (নৃত্য ভবন) তাঁর স্মৃতি বহন করছে। নৃত্যলাল দত্তের উত্তরসুরিরা বর্তমানে জগদ্ধাত্রী পুজোর দায়িত্বে ব্যাপৃত আছেন।

জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন সকাল থেকেই অতিথি-অভ্যাগতদের সমাগমে 'নৃত্য ভবন' মুখরিত হয়ে ওঠে। দত্ত পরিবারের যে সব সদস্য অন্যত্র বাস করেন, তারাও জগদ্ধাত্রী মাতার অমোঘ আকর্ষণে 'নৃত্য ভবন'-এ উপস্থিত হন। জগদ্ধাত্রী পুজো এদের কাছে পারিবারিক মিলেনৎসবও। এই দিনটির জন্য দত্ত পরিবার সারা বছর সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

ডাকের সাজে সজ্জিতা স্বর্ণালংকারে ভূষিতা নয়নাভিরাম মাতৃমূর্তি। মায়ের শান্ত স্নিগ্ধ প্রসন্নময়ী রূপে হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। দেবী জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ডান পায়ের জানুর উপর বাম পা রেখে বাহন সিংহের উপর উপবিষ্টা। দেবীর বাহন শ্বেতবর্ণের সিংহ। সিংহের পদতলে হস্তিমুণ্ড। দেবীর দুই পাশে দুই সহচরী— জয়া ও বিজয়া।

জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেরদিন সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। পুজোর দিন সকালে ৭ নম্বর বাবুরাম শীল লেনস্থ ঠাকুরবাড়ি থেকে নারায়ণ, মা মঙ্গলচণ্ডী, মা লক্ষ্মী-কে 'নৃত্য ভবন'-এ নিয়ে আসা হয়। এরপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও চক্ষু দান করে পুজোর অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ক্রমান্বয়ে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো ও নবমী একই দিনে নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধি পুজোয় ১০৮ প্রদীপ প্রজ্বলনে সমগ্র বাড়িতে এক পবিত্র ও ভাবগম্ভীর আবহ তৈরি হয়, চাক্ষুষ না করলে যা কল্পনা করা যাবে না। মৃন্ময়ী মা যেন তখন চিন্ময়ী রূপে প্রতিভাত হন।

অষ্টমী ও সন্ধিপুজোর মধ্যবর্তী সময়ে মহিলারা দু'হাতে দুটো সরা এবং মাথায় একটা মালসা নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে বসে কাঠ-কয়লার আগুনে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ধুনো পেড়ান। এটি সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব রীতি। বৈষ্ণব মতে পুজো হয় বলে বলির প্রথা নেই। অন্নভোগ হয় না। সংকল্প হয় পালাদারের নামে। পুজোর ব্যয় নির্বাহ হয় 'জগদ্ধাত্রী মাতা'র নির্দিষ্ট বাড়ির ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকে।

পরদিন সকালে দশমী পুজো সমাপনান্তে দর্পণে মায়ের চরণ দর্শনের পালা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মায়ের বিদায় মুহূর্ত। সকলের মন তখন ভারাক্রান্ত। বিকেলে বেদি থেকে মা-কে উঠোনে নামানোর পরে মহিলারা বরণ করেন ও সিন্দুর খেলায় মেতে ওঠেন। সবশেষে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য মা জগদ্ধাত্রীর পা ধুইয়ে দেন এবং মা-কে কানে কানে আগামীবছর আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উল্লেখ্য, সেই সময় অন্য কেউ উপস্থিত থাকবে না। এরপর কণকাঞ্জলি দিয়ে মা জগদ্ধাত্রীকে বিদায় জানানো হয়।

পারিবারিক রীতি অনুযায়ী, বাবুঘাটে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। আগে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো নৌকায় করে মাঝ গঙ্গায়। বর্তমানে প্রশাসনিক অনুমতি না মেলায় বিসর্জনের সেই রীতি অনুসৃত হয় না।

ফিরে এসে শান্তিজল গ্রহণের মধ্যে দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর পরিসমাপ্তি ঘটে। আবার এক বছরের প্রতীক্ষা। সকলের কণ্ঠে তখন একটাই প্রার্থনা— 'আবার এসো মা'।

(এই প্রতিবেদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন দত্ত পরিবারের সদস্য অসিত দত্ত।)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

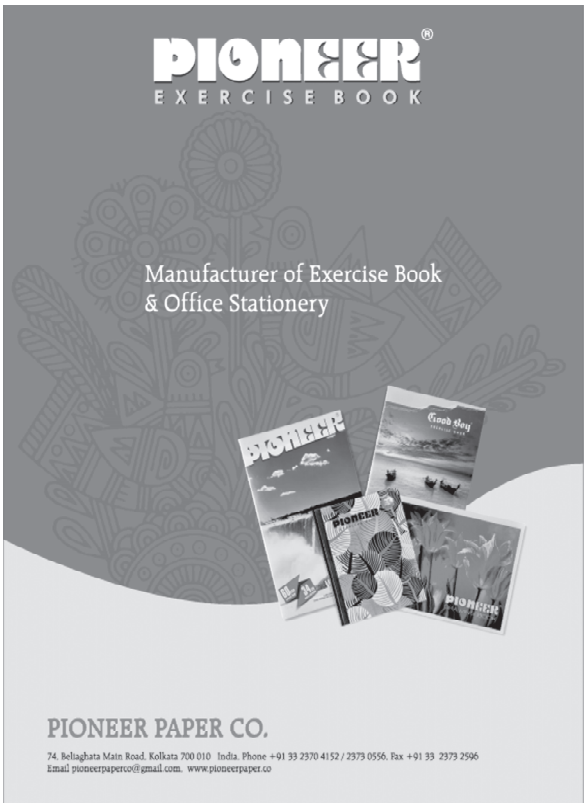

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

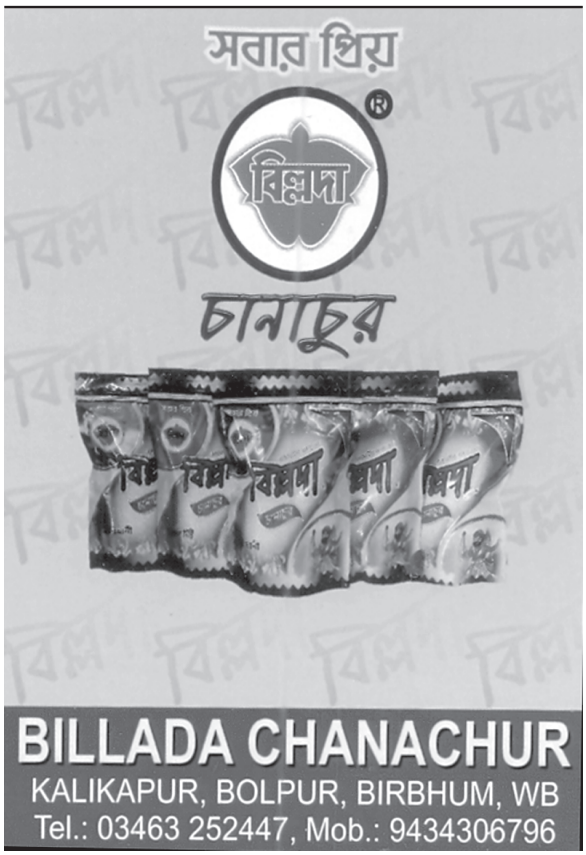

রামলখনের ঘর ওয়াপসি

পার্থসারথি গুহ

রামলখনকে ছাড়া বালিগঞ্জ ইউনাইটেডের দুর্গাপুজো একেবারেই অচল। আসলে রামলখন যাদব আর ওর স্ত্রী মনোরমা দেবী পুজোর সময় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবেতেই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১০৮টা প্রদীপ জ্বালালো, পদ্মফুল জোগাড় করা, রেড়ির তেল আনা, পুজোর বাজার করা, ঢাকিরা ঠিকমতো খেল কি না তার দেখভাল করা, সন্ধিপুজোর সময় ঠাকুরমশাই দেরি করছে কেন সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকে যাদব পরিবারের। পুজোর কটাদিন শুদ্ধাচারে সকাল থেকে উপোস করে সবকিছু ঠিকমতো পালন করে তারা। রামলখন না থাকলে আগামীতে কী করে পুজো হবে তা নিয়েও নিজেদের মধ্যে আজকাল বেজায় উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় পাড়ার বড়দের।

এই তো সেদিন প্রকাশের চায়ের দোকানে রোজকার মতো আড্ডা হচ্ছিল পাড়ার প্রবীণ সদস্য হীরালাল চক্রবর্তী, সুনির্মল হালদার, তপন সমাদ্দার, প্রভাত মুখার্জিদের। সেখানেই উঠল পুজো প্রসঙ্গ। এই ক্লাবের ফাউন্ডার মেম্বার বলতে যা বোঝায় তা হলো এই চারমূর্তি। রামলখনের কথাটা তুললেন তপন সমাদ্দার। হীরালালবাবুকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললেও তার লক্ষ্য ছিল বাকি সকলেই। 'হীরাদা শুনেছেন, রামলখনের কথাটা?' একযোগে সবাই তার ওপর হামলে পড়ার আগেই তপনবাবু বলতে লাগলেন, 'যা শুনছি ওর নাকি খুব অভিমান হয়েছে। যে মানুষ ন' মাসে ছ' মাসেও দেশের বাড়ি যায় না, সেই রামলখনই বারবার বলছে, 'দাদা হমারে এবার ছাড়িয়া দেন, নিজের মুলুকে ফিরে যাব।' 'হ্যাঁ আমাকেও রামলখন ঠিক এই কথাই বলেছে।' এবার মুখ খুললেন সুনির্মল হালদার। প্রভাত মুখার্জি আর হীরালাল চক্রবর্তীর হাবভাব থেকেও বোঝা গেল রামলখন যাদবের 'ঘর ওয়াপসি'র সমাচার ওঁদের কানে গেছে। পুজোর আর বাকি মাত্র ২ মাস। তার আগেই ক্লাবের সম্পদ হয়ে ওঠা রামলখনের এভাবে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাকে মানতে পারছে না কেউই। কিন্তু রামলখনও নাছোড়বান্দা। বিহারের সমস্তিপুরের ভিটেয় পুরো পরিবার নিয়ে ফিরে যাবে। ওর কথায়, 'বাবু হমার কি কষ্ট হচ্ছে না। ছোটোবেলা থেকে এই বঙ্গমায়ের বুকে বড়ো হলাম, রোজগারপাতি করতে শিখলাম, বিয়া-শাদি হলো, বাচ্চারা বড়ো হলো। আর এখন নিজের ঘড় ছেড়েই চলে যেতে হচ্ছে।'

কলকাতা নিয়ে আর পাঁচজন বাঙ্গালির যা আবেগ তার থেকে কোনও অংশে কম নয় রামলখনের ভালোবাসা। দুর্গাপুজোয় এখনও নিয়ম করে পুরো পরিবারের জন্য নতুন জামাকাপড় কেনে। শুধু কি তাই, এখানে থাকতে থাকতে রুটির থেকে ভাতই ওর বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে। তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই রসিকতার সুরে বলে, আরে জন্মসূত্রে আমি বিহারি হতে পারি। কিন্তু আসলে আমি ষোলোআনা বাঙ্গালি।' সৌরভ গাঙ্গুলি যখন খেলত তখন রামলখন টিভির সামনে থেকে সরত না কিছুতেই। একবার তো সৌরভকে নিয়ে ওর এক পড়শী বিনোদ ঝার সঙ্গে রীতিমতো হাতাহাতি হয়েছিল রামলখনের। সৌরভ মনে হয় সেই ম্যাচটায় অল্প রানে আউট হয়েছিল। ধোনি তখন সবেমাত্র খেলা শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ধোনি ভালো রানও করেছিল। এসবের মধ্যেই ওদের বাড়ি টিভি দেখতে এসে বিনোদ সৌরভের খুব নিন্দা করছিল। বলছিল, 'দেখা ধোনি ক্যায়সা ধমাকা কর রহা হ্যায়। আউর আপ খালি দাদা দাদা করতা হ্যায়।' বিনোদের এই কথায় যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। রামলখন বিনোদকে কষিয়ে দেয় এক থাপ্পড়। বিনোদও তেড়ে আসে ওর দিকে। এমন

অবস্থা হয়েছিল, যে পাশের বাড়ির লোকেদের ছুটে আসতে হয়েছিল ঝামেলা থামাতে। তাদের সামনেও সমানে তড়পে যাচ্ছিল রামলখন। বারবার খালি বলছিল 'আমি যেখানে বড়ো হয়েছি সেই মাটিকে আমি ভালোবাসব না। আরে বাবা, বাঙ্গলা তো আমার যশোদা মাইয়া। খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করেছে। সৌরভ আমাদের ঘরের ছেলে, দেশের নাম রোশন করেছে। পুরো দলটাকে একসূত্রে বেঁধেছে। তাছাড়া যেমন ব্যাটিংয়ের হাত, তেমনই বুক চিতিয়ে ক্যাপ্টেনসি করে। একটা ম্যাচ খারাপ খেললে ওকে নিয়ে বাজে কথা বলব। রামলখন সেই বান্দা নয়। নিমকহারামি আমার খুনে নেই।'

এই হলো রামলখন। সকালে উঠে নিয়ম করে হনুমান চল্লিশা পাঠ করা, রাম-সীতার ভজন শোনও যেমন ওর ডেলি রুটিন, ঠিক তেমনই রবীন্দ্রসংগীতও নিয়ম করে শুনে থাকে ও। উদাত্ত কণ্ঠে হিন্দি টান সত্ত্বেও ওর আকাশভরা সূর্যতারা মুগ্ধ করে সকলকে। লক্ষ্মণের মারিচ বধ প্রসঙ্গে গেয়ে ওঠে আমার সোনার হরিণ চাই। এতটাই যার সংস্কৃতি বোধ, সেই মানুষটাই কেন পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে তা এলাকাবাসীর মনে বড়ো প্রশ্ন জাগিয়েছে।

রামলখনের নাকি মন ভেঙে গেছে। যে পশ্চিমবঙ্গকে ও মায়ের মতো ভালোবাসত সেখানেই এত সন্দেহের বীজ দানা বেঁধেছে যে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না। কিছু কিছু মতলবি দেশওয়ালি ভাই বলছে, 'আর এখানে থেকে কারবর চালাতে পারবে না রামলখন ভাইয়া। শুনছ না, জয় বাংলা স্লোগান।' বাংলাদেশের ডায়লগ এখানে আউড়াচ্ছে ওরা। রামলখনের তো এখানেই সওয়াল। 'আরে বাবা আমি তোদের চেয়ে কম ভালোবাসি না বাঙ্গলা মা'কে। তা বলে এমন মতলববাজের মতো স্লোগান দিতে হবে। রাজ্যের প্রধান যেদিন ওই যে আউটসাইডার বললেন না, সেদিন তো কষ্টে রাতে কিছু মুখে দিতে পারেনি রামলখন। মনোরমা অনেক সাধ্যসাধনা করার পর, খালি বিড়বিড় করে বলতে থেকেছে, 'এতদিন পর কিনা আমরা আউটসাইডার হয়ে গেলাম।' অভিমানে বাকরুদ্ধ হয়ে উঠেছে তার। চোখ দিয়ে খালি টপটপ করে জল পড়েছে।

সেই কোন ছোট্টবেলায় বাবার কাঁধে চেপে এই বালিগঞ্জ এলাকায় পা রেখেছিল রামলখন। অভাবের সংসারে সেভাবে পড়াশুনা হয়নি। দুধের কারবার ছিল ওদের। দাদু দিনদয়াল যাদব তিলে তিলে ওদের ব্যবসাটা গড়ে তুলেছিলেন। ওর বাবা রামস্বরূপ তা আরও বড়ো করে তোলে। রামলখন অবশ্য দুধের কারবার করেনি। আস্ত একটা মুদিখানার দোকান করেছিল। ওদের ঘরের লাগোয়া দোকান। দোকান আর পরিবারের বাইরেও পাড়ার মানুষের আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত রামলখন। স্ত্রীকে দোকানে বসিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াত সে।

পুজোর সময় চারদিন দোকান বন্ধ রেখে বালিগঞ্জ ইউনাইটেডের পুজোয় জান লড়িয়ে দিত যাদব পরিবার। বাবার মুখ শুনেছে স্বাধীনতার পরে পরেই কলকাতায় যে ভয়ংকর নরসংহার হয়েছিল তাতে ওদের এলাকায় আঁচ আসতে দেয়নি ওর দাদু দিনদয়াল। লাঠি খেলা আর কুস্তিতে পারদর্শী দিনদয়াল আর কয়েকজনকে জুটিয়ে এলাকার ইজ্জত বাঁচিয়েছিল।

সেই তাদের কিনা আজ পরদেশি বলে কটাক্ষ করা উচিত। এই অপমান কিছুতেই সইতে পারছে না রামলখন। মনোরমা বোঝাতে এলে তাকে বলছে, ইমান বিসর্জন দিয়ে কী করে থাকি বলো। দেশের বাড়িতে যাইহোক জমিতে চাষ করে চলে যাবে। ছেলেপুলেরাও ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে দেখো।' ■

পরিতৃপ্তি

বারিদবরণ বিশ্বাস

আজ কদিন ধরে যেন বৃষ্টির বিরাম নেই। হয়েই চলেছে তো হয়েই চলছে। জামা কাপড় কাচতে না পেরে মেঝের উপর ডাই করা রাখা। তার উপর আমার সুগারের সমস্যা। রোজ কিছুটা করে হাঁটি। এ কদিনে সেটাও আর হবার নয়। আকাশের এমন মুখভার কদিন ভালো লাগে? তাছাড়া আমি না হয় সরকারি চাকুরে, দিন তিনেক হামেশা সি এল নিতে পারব, কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো কী হবে ভাবলে খারাপ লাগে। শিমুলের মা বলছিল, মাঠে থেকেই সবজিগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। যেগুলো তুলেছিল সেগুলোও বিক্রি করতে পারেনি।

বউ ঘরে নেই। আমি এখন একা। দুদিন তবুও রেইনকোট পরে স্কুলে গেছি। তবে ওইটুকুই। স্কুল আর ঘর। এ কদিন ডাল আর আলুসেদ্ধ, আলুভাজা করে বেশ চলছিল। কিন্তু এখন আর যেন ওগুলো মুখেই তুলতে পারছি না। কী যে করি!

আজ মহালয়ার ছুটি। ভেবেছিলাম দামোদরের জলে নেমে প্রতিবারের মতো এবারও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্য তিলতর্পণ করে বাজারে গিয়ে কিছু ভালোমন্দ কিনে এনে খেয়ে জমাটি ঘুম দেব। আঃ মরণ! পাজি বৃষ্টি সেটিও মাটি করে ছাড়ল গো।

এক ভাবে হয়েই যাচ্ছে, চলেছে। তাও একটু ফিসফিসিয়ে হতে পারত। ওমা এদেখি ঝমঝমিয়ে শুরু করেছে। সারা বর্ষাকাল জুড়ে গরমে কীভাবে হাইডাই করে মরেছি। মনে প্রাণে কতবার বলেছি, ওরে বর্ষা, তুঁহু মম শ্যাম সমান। আবার আয় বৃষ্টি আয়রে, ধান দেব মেপেরে। কোথায় বৃষ্টি? অনাবৃষ্টিতে এবার সব শুকনো। ডোবা পুকুর হাফের হাফ। ব্যাংগুলো পর্যন্ত তাদের গোঙা গোঙা গান গাওয়া ভুলে গেছে।

আর এখন ইনি অসময়ে তার ঝমঝমানি বাদ্য বাজাতে শুরু করেছেন। একি সহ্য হয়!

সামনে বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর সেই আনন্দ মাটি করতে তোর এখন এই ফাজলামি। রাগে যেন গর গর করছিল মনটা।

সেই সময় দেখি একটা লোক ভ্যান টানতে টানতে হাঁক পাড়ছে, সবজি, সবজি চাই। আমি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু যাবো কী করে? মুহূর্তে চিন্তা করে আমিও হাঁক দিলাম কী সবজি?

উত্তর এলো পটোল, বেগুন, কচুর লতি, কলমি শাক, প্লাস্টিকে মোড়া লোকটা এগিয়ে এলো ভ্যান নিয়ে আমার নেওয়া না নেওয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে।

আমি একটি ভাঙ্গা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে দেখলাম, ডালাগুলোতে রাখা সবজিগুলো সব প্রায় আধপচা।

দলুকাকা আমাকে দেখেই বললো, তুমি। এখানে কতদিন?

উত্তর দিলাম, মাস দুয়েক হলো। তা তুমি কতদিন এ পেশায়? কারখানার কাজ কী হলো?

''এই তো বছর খানেক হলো। কী করবো বল বাপ। কারখানা বন্ধ। শুয়ে বসে আর কতদিন? যা জমিয়েছিলাম, তা তোর কাকিমার অসুখের পিছনেই শেষ হয়ে গেল। তারপর কতদিন আর বসে থাকতে না পেরে—বললো দলু কাকা। বৃষ্টিতে ভিজে একশা দেখে আমি বললাম, ঘরে এসো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তো তোমার বড়ো একটা অসুখ বেধে যাবে।

দলুকাকা শান্ত শুকনো মুখে বলল, আর কী সুখে আছি বাপ! এ কদিন বসেই ছিলাম, পরে আজ বেরিয়ে পড়তে হলো। তোর কাকিমা বলল, চাল বাড়ন্ত। আমরা দুটি না হয় উপোস করেই কাটালাম। কিন্তু ঘরে যে আমার পোয়াতি মেয়েটা। ওর মুখে তো দুটি দিতে হবে। সহসা আমার সাথীর কথা মনে হলো। ও আট মাসের পোয়াতি। এখন ভালো মন্দ যেটা খেতে চায়, খাওয়াতে হয়। আমি যথাসাধ্য খাওয়াইও। কিন্তু দলুকাকার মেয়ে! আমি ওকে সেই ছোট্ট থেকে চিনি। বড়োই লাজুক। অভাবের তাড়নায় কতদিন টিফিনে জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। খিদে পেলেও বলত, খিদে পায়নি। তোরা খা। সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে বিকাল পাঁচটায় বাড়ি ফিরতাম।

বলতাম খিদে পায়নি বললে বিশ্বাস করবো। খেতে বলছি খা। অনেক জোরাজুরি করলে তবেই নিত। আর যখন খেত, তখন লক্ষ্য করতাম অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা ওর চোখে মুখে।

আমার সম্বিত ফিরল, কাকার কথায়। ''কী কী নেবে বললে না তো। তোমাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে আরও দুঘর যাই। যদি দু কেজি চালের পয়সা উপায় করতে পারি।'' আমি টপাটপ কিছু পটোল, বেগুন, ট্যাঁরস নিয়ে ওজন করতে দিয়ে ঘরে এলাম। একশোটাকার নোট ঘরে থাকা সত্ত্বেও পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বললাম, নাও। দলুকাকা আতঙ্কের সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে এ কী বিপদে ফেলচ বাপ! পাঁচশো টাকার ভাংটি এখন কোথায় পাবো? খুচরোই দাও না। এই বর্ষার মধ্যে তোমাকে দিয়ে প্রথম এই বউনি করছি।

আমি বললাম, কাকা ভাংটি করে তোমাকে দিতে হবে না। এই পুরো টাকাটাই তুমি রাখো।

দলুকাকা বোধ হয় কিছুটা অপমানিত বোধ করল। বলল, তুমি আমাকে দয়া করছ? এ তুমি রাখো। খুচরো থাকলে তবেই দাও, নইলে পরে দিও।

আমি কাকার হাতে ধরে বললাম, কাকা, তুমি এটা রাখো। বাকি টাকার সবজি দিয়ে না হয় শোধ দিও। তুমি এটাকে দয়া ভাবছ কেন? তাছাড়া দুর্গা কি আমার কেউ নয়?

আমরা একসঙ্গে পড়েছি। ভাই-বোনের মতোই তো মানুষ হয়েছি। তুমি আমাকে পর ভেবো না। সুবিধা অসুবিধার কথা জানিও।

দলুকাকা এবার টাকাটা নিল। আমি বললাম, আজ এইপথে আর না ভিজে বাড়ি চলে যাও। ''তুমি আমাকে বাঁচালে বাপ। দুর্গার ওষুধও ফুরিয়েছে দুদিন'' বলে—

দলুকাকা মুখে আর বিশেষ কিছু বললে না। একবার শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের উদ্দেশে হয়তো কিছু বললো।

টাকাটা পুজোর চাঁদার জন্যই তোলা ছিল। হয়তো ওরা আসবে। একটু রাগারাগি করবে। কিন্তু তা সব সইতে পারব জ্যান্ত দুর্গার উপবাস দূর করার সান্ত্বনা নিয়ে। বহুদিন পর এমন একটা কাজ করতে পেরে মনটা একটা অজানা আত্মতৃপ্তিতে ভরে গেল, যা আগে কখনো হয়েছে বলে মনে করতে পারি না। ■

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগিনী নিবেদিতা

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৭ সাল ! ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ এসে ভারতে পৌছালো। সেই জাহাজ থেকে নেমে এলেন সিংহিনীর মতো তেজ, প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্না এক আইরিশ নারী। আইরিশ কিন্তু তাঁর কাথাবার্তায় ভারতের চিত্র ফুটে উঠেছিল। সেই নারী হলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর মধ্যে বহু সত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর বৈপ্লবিক সত্ত্বাটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ভগিনী নিবেদিতা ভারতে আসা মাত্রই স্বামীজীর কথা অনুযায়ী ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করলেন। নিবেদিতা অবাক হয়ে গেলেন যে, ভারতের প্রাচীনকাল থেকে এত গৌরব থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতের চরম দুর্দশা কেন? তিনি নিজেই অনুভব করলেন এর একমাত্র কারণ হলো পরাধীনতা। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতমায়ের শৃঙ্খল মোচনে অঙ্গিকারবদ্ধ বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করতে।

অনুশীলন সমিতি নামক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার নিবিড় সংযোগ ছিল। তিনি সর্বতোভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। ড. নিমাই সাধন বসু বলেছেন, অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'-এর ওপর নিবেদিতার 'কালী দ্য মাদার' বইয়ের প্রভাব ছিল। অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানী মন্দির' ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনের পথে চালিত করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন যে, বিপ্লবীদের শক্তিসাধনায় এবং অরবিন্দের চিন্তায় কালী দ্য মাদার বইয়ের প্রভাব ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার নিবেদিতার সম্বন্ধে তাঁর 'History of freedom movement' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন যে, অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ চন্দ্র বসু নিবেদিতার কাছে নির্দেশ পেয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা অনুশীলন সমিতির প্রথম বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়। তার আগে বিখ্যাত জাপানি লেখক ও গবেষক ওকাকুরা ভারতে আসেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। নিবেদিতা তার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে কীভাবে আরও জোরদার করা যায়। ১৯০৫ সালে বড়োলাট কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করলেন। তার ফলে সারা বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠল। এরপর কার্জন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। তিনি ভাষণে বলেন যে, ভারতীয়রা মিথ্যাবাদী। সেই অনুষ্ঠানে বিদ্বান ভারতীয়দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। এই কথা শুনে ক্ষোভে, রাগে, লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে ওঠে। নিবেদিতা বেরিয়ে যান এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে একটি লাইব্রেরিতে যান সেখান থেকে একটি বই বের করে দেখান যে কার্জন কত বড়ো মিথ্যাবাদী। পরেরদিন স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন যে, কার্জন যখন কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন তিনি মিথ্যা বলে নিজের বয়স কমিয়ে ছিলেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতীয়দের সত্যবাদিতা প্রমাণ করেছিলেন। যা তৎকালীন কোনো ভারতীয় নেতা করতে পারেননি। কারণ, ভগিনী নিবেদিতা ভারতের প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ ছিল পবিত্র ভূমি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না কিন্তু আমরা ভারতীয়রা এতটাই আত্মবিস্মৃত জাতি যে, তাঁর অবদানকে আমরা প্রকৃত সম্মান, ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও দিতে পারিনি। আসুন আমরা সবাই মিলে ভগিনী নিবেদিার ১৫২তম জন্মবার্ষিকীতে এই মহা মানবীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গঠনে ব্রতী হই।

আমরা যদি লিজেল রেঁম-র কথা দেখি তাহলে দেখব তিনি বলেছেন যে, ভগিনী নিবেদিতা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বিজ্ঞানাগারকে বোমা তৈরির কাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেছেন যে, ''বিখ্যাত রাসায়নিক এবং যথার্থ বাঙ্গালি দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কীভাবে বোমা তন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন তা এক বিপ্লবীর স্মৃতিকথায় বর্ণিত আছে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে তাঁর গোপন সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত ছাত্রের সঙ্গে বিস্ফোরক প্রস্তুতির ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা বহু সময় তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বহু বিপ্লবীকে ব্রিটিশরাজের রক্তচক্ষু থেকে বাঁচান। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দের সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের কথা জানতে পেরে নিজেই তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে চরমপন্থী নেতা লালা লাজপত রায়ের যোগাযোগ ছিল। তিনি লিখেছেন যে, 'তাঁর মুখ থেকে যে কথা শুনেছিলাম তা কখনো ভুলব না। ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর দারুণ ঘৃণা এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তার প্রবল ভালোবাসা'। ভগিনী নিবেদিতা ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী আদর্শে আদর্শান্বিত হলেও তিনি কখনো নরমপন্থী বা মধ্যমন্ত্রীদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেননি। কারণ, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। যেসব ব্যক্তি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিলেন সে চরমপন্থী হোক বা নরমপন্থী হোক নিবেদিতা তা না দেখে নির্দ্বিধায় তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে গিয়েছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন একজন রাজভক্ত সাহিত্যিক ছিলেন, কিন্তু তিনি দেশের জন্য প্রচুর

কাজ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সুসম্পর্ক ছিল। নিবেদিতা তাঁকে বলেছিলেন যে, ''দীনেশবাবু আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সেদিক দিয়ে আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নয়, মর্মপীড়া দান করে; কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভালো লাগে। কেন শুনবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের দাবি করবার যোগ্যতা রাখেন।'' এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভগিনী নিবেদিতা কতটা দূরদর্শী নারী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবাসী যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাহলে ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধীনতা পাবে। নিবেদিতা নরমপন্থী নেতা গোখলে, উপেন্দ্রনাথ বসু আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছিলেন। ভগিনীর এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ সরকার গোয়েন্দা দিয়ে তাঁর পেছনে নজরদারি চালাতে থাকে। এমনকী বিভিন্ন প্রমাণ থেকে জানা জায় যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা ও তার দীর্ঘ কারাবাসেরও সম্ভাবনা ছিল। নিবেদিতা গ্রেপ্তারি এড়াতে একাধিকবার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। এমনকী ভারতের ফরাসি অধিকৃত স্থানগুলিতে আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর।

ভগিনী নিবেদিতা বৈপ্লবিক বক্তব্য ছাপাবার জন্য গোপন প্রেসের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনারও ব্যবস্থা করতেন। নিবেদিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন যে, ''ভারতের জন্য আমি কিছুই করছি না, আমি শিখছি আর তড়িৎ স্পর্শে শিউরে জাগছি। কীভাবে চারা গাছ বেড়ে ওঠে, তাই দেখতে চাইছি। সেটা বুঝে উঠতে পারলেই মনে হয় আমি জানব যে, ওটিকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার দরকার নেই। ভারত জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন ছিল, সেই সময় একদল ডাকাত তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ভূসম্পত্তি ধ্বংস করেছে। ফলে ভারতের তন্ময় ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতের দল তাকে শেখাবে? না! ডাকাতদের খেদিয়ে দিয়ে ভারতকে ফিরে যেতে হবে স্বভূমিতে। এখন এই ধরনের প্রচেষ্টাই ভারতের পক্ষে যথার্থ

কার্যক্রম। সুতরাং, যতক্ষণ সরকার বিদেশি ততক্ষণ খ্রিস্টান (মিশনারি) বা সরকারের তাবেদারদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া নয়...'' এই ধরনের আগুনে লেখা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা লিখতে পারেননি যা নিবেদিতা দৃঢ় ভাবে লিখেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বক্তৃতার দ্বারা ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি এক জায়গায় বলেন যে, ''How long O Lord-how long? oh if Mother would give me' strength like the Thunder-bolt' and words with unspoken menace in them and weight of utterance'' ভগিনী নিবেদিতা ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ভারতীয় ঐতিহ্য, দর্শন, ধর্মকে পুনর্জীবিত করতেই শক্তির আরাধনা করেছিলেন। ভারতীয়দের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান ''হে ভারত! তোমার সন্তানগণের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা সাহসী, তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন এবং শ্রেষ্ঠ তাদের ওপর এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অপমান বর্ষিত হচ্ছে— কে তার একটিরও প্রায়শ্চিত্ত করবে বলো'? তিনি আরো বলেন যে, ''জীবন-জীবন-জীবন আমি জীবন চাই! আর জীবনের একমাত্র প্রতিশব্দ স্বাধীনতা। তা না থাকলে মৃত্যুও শ্রেয়।'' নিবেদিতা দশেরার সময়ে নাগপুরে যান। ওখানকার স্থানীয় মরিস কলেজের কর্তৃপক্ষ একটি সভার আয়োজন করেন। সভার আয়োজকরা ঠিক করেন সভার সভানেত্রী পদ অলংকৃত করবেন ভগিনী নিবেদিতা এবং উত্তম ক্রিকেটারদের হাত দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। ভগিনীকে সভানেত্রী হওয়ার কথা বলা হয় তিনি রাজিও হন কিন্তু তাঁকে পুরস্কার প্রদানের কথা বলা হয়নি। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় দশেরার পূর্বদিনে 'অস্ত্র পূজার' দিনে। ভগিনী বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, অস্ত্র পূজার দিনে ভারতীয়রা বিদেশি খেলা খেলে গৌরব কুড়ানোর চেষ্টা করছে! তিনি তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করে বললেন, 'আমরা কীভাবে দেবী দুর্গাকে ভুলে গেলাম— তাঁর খড়্গকে তাঁর শক্তির বাণীকে!!' তিনি আশা করেছিলেন মারাঠা বীরত্বের কিছু চিহ্ন দেখতে পাবেন এই অনুষ্ঠানে। তিনি পরেরদিন তরবারি খেলা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয়দের সুপ্ত বীর্যবান সত্ত্বাকে জাগ্রত করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভগিনী কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে অংশ নেন। তিনি সেখানে নেত্রী হিসেবে ভাষণ দেননি; ধরিত্রী যেমন গাছকে নানা উপকরণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে আর ধাত্রী যেমন ছোটো শিশুকে বড়ো করে তোলে ঠিক তেমনি ভগিনী নিবেদিতাও ধরিত্রী ও ধাত্রীর ভূমিকা নেন। তিনি ওই অধিবেশনে ভারতের জাতীয় পতাকা কী হবে তার একটি পরিকল্পনা দেন। তাঁর অঙ্কিত পতাকা ছিল রক্তাভ বর্ণের এবং মাঝে বজ্র চিহ্ন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ত্যাগের সঙ্গে বজ্রের মতে বীর্যবান সত্তা চাই।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না কিন্তু আমরা ভারতীয়রা এতটাই আত্মবিস্মৃত জাতি যে, তাঁর অবদানকে আমরা প্রকৃত সম্মান, ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও দিতে পারিনি। আসুন আমরা সবাই মিলে ভগিনী নিবেদিতার ১৫২তম জন্মবার্ষিকীতে এই মহা মানবীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গঠনে ব্রতী হই।

(ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

জাতকের গল্প

শোনা কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়

বহুকাল আগে বোধিসত্ত্ব একবার সিংহকুলে জন্ম নিয়েছিলেন। এক গভীর জঙ্গলে অন্যান্য পশুর সঙ্গে তিনি বাস করতেন। ওই জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চলে গেছে বিশাল সমুদ্র। বেল ও তালগাছের সারি ছিল সমুদ্রের ধার ঘেঁসে।

একটি তালগাছের নীচে বাস করত এর খরগোশ। খরগোশটি প্রায়ই অদ্ভুত চিন্তা করত। একদিন তালগাছের নীচে শুয়ে শুয়ে খরগোশ চিন্তা করছে হঠাৎ যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সে যাবে কোথায়? এই সময় গাছ থেকে বিশাল জোরে শব্দ করে একটা বড়ো তাল পড়ল। বোকা খরগোশ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করেছে। খরগোশ নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে লাগল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এই সময় খরগোশটিকে দেখতে পেল আর একটি খারগোশ। দ্বিতীয় খরগোশটি জিজ্ঞাসা করল, আরে ভাই দাঁড়াও দাঁড়াও, এত জোরে ছুটছ কেন? প্রথম খরগোশটি বলল, ছুটছি কী আর এমনি এমনি, প্রাণের দায়ে ভাই। জান না পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় খরগোশ সেকথা শুনে কোনো চিন্তা না করেই প্রথম খরগোশের সঙ্গে সেও ছুটতে শুরু করল।

এক সময় দেখা গেল জঙ্গলের সব খরগোশ প্রাণ বাঁচাতে ছুটে চলেছে। একটি হরিণ মনের আনন্দে জঙ্গলের মধ্যে ঘাস খাচ্ছিল। এক সঙ্গে এতগুলো খরগোশকে ছুটতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার তোমরা সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছ কেন? সব খরগোশ এক সঙ্গে বলে উঠল, পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করেছে। তুমি বাঁচতে চাও তো পালাও। একথা শুনে সেই হরিণও তাদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করে দিল। এই ভাবে এক সময় দেখা গেল জঙ্গলের সব পশুই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে প্রাণ বাঁচাতে।

সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব জঙ্গলের সব পশুকে একসঙ্গে ছুটে যেতে দেখে একটি হরিণকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞসা করতেই সে বলল পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করেছে, তাই সবাই প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাচ্ছি। বোধিসত্ত্ব দেখলেন মহা বিপদ। এরা সবাই ছুটে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে প্রাণ হারাবে। যে করেই হোক এদের বাঁচাতে হবে। তিনি তো এদের রাজা। তিনি তখন ছুটে গিয়ে পশুদের সামনে হুংকার ছেড়ে বললেন, দাঁড়াও। নিমেষে সব পশু দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনি প্রথম খরগোশটিকে জিজ্ঞাসা করলেন কী করে জানলে যে পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে? খরগোশটি বলল আমি নিজের চোখে দেখেছি। বোধিসত্ত্ব বললেন তুমি কী দেখেছ? কোথায় এই ঘটনা ঘটেছে? খরগোশ বলল আমি তালগাছের তলায় শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে ভাবলাম পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করেছে। তাই আমি ছুটছি। বোধিসত্ত্ব সবাইকে বললেন, সবাই এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। আমি এখুনি দেখে আসছি।

এরপর বোধিসত্ত্ব খরগোশটিকে সঙ্গে নিয়ে তালগাছের তলায় গেলেন। খরগোশ একটি পাকা তাল দেখিয়ে বলল, এই বড়ো জিনিসটি পড়ার শব্দ শুনে আমি ভাবলাম পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু করেছে। বোধিসত্ত্ব পুরো ব্যাপারটি বুঝলেন। তিনি পশুদের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তারপর বললেন, শোনা কথায় কখনো কান দিতে নেই। এর ফলে বিপদের সম্ভাবনা হতে পারে। অন্যের কথা শোনার পর বিচারবিবেচনা করে কাজ করতে হয়, তা না হলে মৃত্যু হতে পারে।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনে সবাই জঙ্গলে ফিরে গেল।

—সংগৃহীত

ভারতের পথে পথে

বৃন্দাবন

মথুরা থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বৃন্দাবন। রাধা-কৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবন। ভারতের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মথুরা-বৃন্দাবনকে একত্রে ব্রজভূমিও বলা হয়। কৃষ্ণপ্রেমের নিদর্শন স্বরূপ চার হাজারেরও বেশি মন্দির রয়েছে এখানে। মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে পড়ে বাৎসল্য গ্রাম ও গীতা মন্দির। সমগ্র গীতা উৎকীর্ণ রয়েছে মন্দিরের স্তম্ভে । এপথে পাগলাবাবার মন্দিরও পড়ে। বৃন্দাবনে রয়েছে গোবিন্দদেবজীর পুরনো মন্দির, বাজারের ডানদিকে রঙ্গনাথজীর মন্দির, মীরাবাঈয়ের ভজন আশ্রম, কিংবদন্তীতে ঘেরা রাধা-কৃষ্ণের লীলাভূমি নিধিবন, শাহজী মন্দির, বস্ত্রহরণ ঘাট, গোপীনাথ জীউ-র মন্দির, নিকুঞ্জ বন, ইসকনের শ্যাম আশ্রম, মদনমোহনজী মন্দির, বাঁকেবিহারী মন্দির,, শ্যামসুন্দর মন্দির, অষ্টসখীর মন্দির, প্রেমমন্দির, দূরে বারসানাতে রয়েছে শ্রীরাধিকার জন্মস্থান, গিরি গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। পুরো ব্রজমণ্ডল ২৬৯ কিলোমিটার অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ।

জানো কি?

- তিন গুণ— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।
- তিন তাপ — দৈহিক, দৈবিক, ভৌতিক।
- তিন ঋণ---পিতৃ ঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ।
- তিন লোক—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল।
- চার আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস।
- চার ধাম— জগন্নাথপুরী, রামেশ্বরম্, দ্বারকা, বদ্রীনাথ।।
- চার যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।
- চার পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।
- চার বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব।

ভালো কথা

ঘুরে এলাম সিকিম

এবার লক্ষ্মীপুজোর রাতে আমি মা-বাবার সঙ্গে সিকিমের উদ্দেশে রওনা হই। আমাদের সঙ্গে আরও বারোজন ছিলেন। পরদিন সকালে আমরা সিকিমের শিলাইগাঁওয়ে পৌঁছই। সেখান থেকে পরদিন সূর্যোদয়ের দৃশ্যের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন করে মন আনন্দে ভরে ওঠে। চারদিনের এই টুরে আমরা একে একে কোলাঘাম, জুলুক ও রোলেপে যাই। বাবা হরভজন সিংহের মন্দির দর্শন করি। সেখানে চারজন মিলিটারিকে মন্দির পাহারা দিতে দেখি। বাবা হরভজন সিংহ সেনাঅফিসার ছিলেন। মৃত্যুর পরও তিনি চীন সীমান্ত রক্ষা করে চলেছেন। আজও তিনি আর্মিদের আরাধ্য দেবতা। তাঁর আত্মা আজও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এখনও সরকার প্রতি মাসে তাঁর বেতন বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। নির্ধারিত ছুটিও তাঁর নামে হয়। সিকিমে আমরা ১৪০০ ফুট ওপরে উঠেছিলাম। সেখানে ২-৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। ছাঙ্গুলেকের ধারে আমি ইয়াকের পিঠে উঠি। আমরা মেঘেরও উপরে উঠেছিলাম। নীচের পাহারের গায়ে সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখা যচ্ছিল। আমার কাছে এই ভ্রমণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রূপসা দেবনাথ, নবম শ্রেণী,বিরাটি, কলকাতা-৪৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল দ ব ক না	(১) ন ম স হো ব ৎ ব
(২) মা নী লি মু	(২) সী বি ভো ন জ লা

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) ধর্মাধিকরণ (২) দ্রুপদনন্দিনী

৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) প্রকৃতিপ্রেমিক (২) বিজয়সেনানী

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (২) শুভম সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া। (৩) শ্যামশ্রী হালদার, ১৮ মাইল, মালদা। (৪) শ্যামল সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১০।।

এইরকম অনেক কাজ করলেও পড়াশুনায় কেশব এগিয়েইছিল। ভালো নম্বর পেয়ে মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। অধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠালেন।

কেশবরাও হেডগেওয়ার ডাক্তার হয়ে নাগপুরে ফিরলেন। পরিবারের লোকজন তাঁকে চাকরি, ব্যবসা, বিয়ে ইত্যাদি করার অনুরোধ করলেন। তিনি তখন কাকা আবাজীকে চিঠি লিখে স্পষ্টভাবে জানালেন—

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। তার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবীরা সারা দেশে নানা পরিকল্পনা নিল। ডাক্তারজী সংগ্রহ, বিতরণ ইত্যাদির কাজ করলেন। একবার নাগপুর স্টেশনে দাঁড়ানো একটা ট্রেন থেকে তিনি গোলাবারুদ পাচার করলেন।

ক্রমশ

জাতি-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে পরিকল্পিত পথে

বিশ্বামিত্র-র কলম

পশ্চিমবঙ্গের অরাজক পরিস্থিতির ছবিটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক হানাহানি, হিংসা, সংখ্যালঘু তোষণের ছবিটা এ রাজ্যে বহুদিনের, বাম আমলের চৌত্রিশ বছর তার নিদারুণ সাক্ষী। তার ওপরে মরিচঝাঁপি, বিজনসেতুর মতো রাজনৈতিক গণহত্যাও যুক্ত ছিল। বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের পরিসর নেই, আবদমিত করেই রাখা হয়েছিল, বর্তমান আমলেও তাই। এসব এ রাজ্যের মানুষের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে নৈরাজ্য চলছে, শুধু রাজনৈতিকভাবে নয় প্রশাসনিক অরাজকতাও তুঙ্গে। যার সুযোগ একদল লুম্পেন নিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে জাতিদাঙ্গার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। এই গোষ্ঠীর কথা সবাই জানে। বাংলাভাষী মানুষকে এমনভাবে 'পক্ষে' পেতে চাইছে এরা, যাতে করে বাঙ্গলা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বাংলাদেশের জামাতগোষ্ঠী দীর্ঘদিন এই অ্যাজেন্ডা নিয়ে চলেছে।

মুসলমান মৌলবাদীরা আগাগোড়াই চেয়েছিল দেশভাগের সময় গোটা বাঙ্গলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়তে। শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের মতো দেশনেতাদের ভুল পথে চালিত করা হয়েছিল। পাকিস্তান দাবির উগ্র সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টিও মুসলমানদের খপ্পরে হিন্দুদের ফেলতে চেষ্টা চালাচ্ছিল। আগামীদিনের বিপদ বুঝে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁরই জন্য বাঙ্গালি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি স্থানে আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজে পেয়েছিল। দেশভাগের সময়কার সেই পদধ্বনি বাঙ্গালি হিন্দুরা আবার শুনতে পাচ্ছেন। সৌজন্যে বাঙ্গালিদের তথাকথিত 'পক্ষা'বলম্বী একটি গোষ্ঠীর উগ্র ভারত-বিদ্বেষ ও জামাত-পন্থা।

এই গোষ্ঠীর কথা বছর কয়েক আগেও কেউ জানত না। রাজ্যের শাসকদলের দেউলিয়াপানার সুযোগে এদের জন্ম হয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন ওই গোষ্ঠীর বড়ো মাথা থেকে ছোটো মাথা সকলেই মূলত শাসকদলের পেটোয়া কর্মী। কমিউনিস্ট পার্টির মুখ-মুখোশ পশ্চিমবঙ্গবাসীর এতদিনে জানা হয়ে গেছে। তাই কুলোর বাতাস দিয়ে তাদের তাড়াতে দেরি হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি শূন্য হতে

দেশদ্রোহীদের একটি প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল, তৃণমূলের মধ্যে তারা সেটা খুঁজে পেয়েছে। একটি 'বাজারি' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়র মধ্যেও সেই আহ্বান দেখা গেছিল। দেশদ্রোহিতার নানা রকমফের আছে, এতদিন আমরা দেখতাম 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি'র মতো বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিতে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অজুহাতে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে'-র ধ্বনি আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করেছিল 'ইনশাল্লাহ' স্লোগান সহযোগে।

এই 'ইনশাল্লাহ' শোনারও পর 'ধর্মনিরপেক্ষতা'য় আমরা যে কতট সুমহান তা প্রতিপন্ন করতে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির দু'টি মেরু তৈরি হয়ে গিয়েছে; এক প্রান্তে তৃণমূল, দেশদ্রোহীদের নয়া ঠিকানা, অন্য প্রান্তে বিজেপি, বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের একমাত্র দিশা। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এই ইঙ্গিতকেই স্পষ্ট করেছে। রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর একদা বাম বিরোধিতা আজ ইতিহাসের পাতাতেই শোভা পায়। একদিকে টুকরে গোষ্ঠী, অন্যদিকে জাতিদাঙ্গা সৃষ্টির পক্ষপাতী গোষ্ঠী, আবার নকশাল, জাতপাত-শ্রম ভিত্তিক রাজনীতির ব্যাপারিরা— সব নিয়ে তৃণমূল দলটা আদতে হরেক রকমের দেশদ্রোহীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে নেতৃত্বের অপরিণামদর্শিতায় এটা মেনে নিতেই হবে।

এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে সুকৌশলে আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দিয়ে, তাকে আর্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা। এই চেষ্টাটির নমুনা অনেকদিনই দেখা পাওয়া যাচ্ছে। পয়লা বৈশাখের সঙ্গে মোগল আমল, আরবীয় সংস্কৃতিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি একদা যারা ভেঙেছিল আজ তারা ফসিল হলেও সেই মানসিকতার যে কোনও পরিবর্তন হয়নি, ফেসবুকে সেই প্রমাণ মিলছিল। হঠাৎ দেখা গেল বিদ্যাসাগর কলেজে মূর্তি ভাঙার পর সেই বিদ্যাসাগর বিদ্বেষীদের বিদ্যাসাগর প্রেম। নানাভাবে বিজেপি এবিভিপিকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল ভোট। ভোট মিটল, কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজ মিলল কই! বঙ্গের মনীষীরা কাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, সবাই তা জানে। এদেরই উত্তরাধিকারীরা আবারও বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে।

গোবলয় শব্দটি আগে ব্যবহৃত হোত, এখন 'গুটকাখোর'; জাতিবিদ্বেষের বিষবহ্নি ক্রমশ ছড়াচ্ছে। বিপন্ন হচ্ছে বাঙ্গালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ। এই 'পক্ষ'দের মধ্যেই এখন নেতৃত্বের লড়াই চলছে, যে যাকে পাচ্ছে বহিষ্কার করছে। বাঙ্গালি হিন্দুরা এদের বিদায় করতে না পারলে অচিরেই দুর্যোগ আরও ঘনাবে। ■

ফঃ ৬

অর্থনীতির মোড় ঘোরানোই নির্বাচনী ফলাফলের সতর্কীকরণ

অতিথি কলম

শৌভিক চক্রবর্তী

আমাদের দেশে মাঝে মধ্যেই নির্বাচন পর্ব লেগে থাকার কারণে নির্বাচনী ফল বেরোলেই তাকে নিয়ে তড়িঘড়ি খুব সাহসী বা খুবই বোকা বোকা বিশ্লেষণ দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এর ফলে অনেক সময়ই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি ধরাই পড়ে না। তবুও নির্বাচনী ফলাফল বেরোবার দিনেই আমার নজরে পড়া লক্ষণগুলি আমি সামনে রাখছি। সাধ্যমতো যুক্তিও সাজাচ্ছি। দুটি রাজ্যই এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকছে।

(১) হরিয়ানায় বিজেপির ফলাফলে স্পষ্ট সেখানকার জাঠ ভোট এককাট্টা হয়ে দলের বিরুদ্ধে গেছে। ২০১৪ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ৩৩.২ শতাংশের চেয়ে এবারে দলের ভোট বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.২ শতাংশ হয়েছে। অথচ দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হলো। এর কারণ জাঠেরা পুরনো জাত-পাতের হিসেব মেনে পঞ্জাবি মনোহরলাল খট্টরকে সরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

(২) মহারাষ্ট্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসনের সঙ্গে জেতা আসনের অনুপাতে বিজেপির সাফল্যের হার বেড়েছে। ২০১৪ সালে অনেক বেশি— ১৬৪টি আসনের মধ্যে ১০৫টিতে জয় পেয়েছে। সাফল্য হার ৭০ শতাংশ। সে সময় জোটসঙ্গী শিবসেনা আলাদা লড়েছিল। অবশ্য এই নির্বাচনে বিজেপি ও শিবসেনা উভয়েরই প্রাপ্ত ভোট শতাংশ অল্প হলেও ২ শতাংশের আশপাশে কমেছে। অবশ্যই ভোটের হারের এই হ্রাস পাওয়াকে কখনই শাসক জোটের বিরুদ্ধে কোনো বড়োসড়ো সুইং হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। কেননা বিজেপি-শিবসেনা এই দু' দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যত টানাপোড়েনই থাক না কেন সরকার গঠন করার প্রশ্নে তারা পর্যাপ্ত স্বস্তিদায়ক সংখ্যায় রয়েছে। হরিয়ানার ক্ষেত্রেও বিজেপিই এককভাবে সব থেকে বড়ো দল।

(৩) আজকাল রাজ্য নির্বাচনের ফলাফল ও কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ফল প্রায়শই সম্পূর্ণ আলাদা হচ্ছে। সে কারণে কোনো রাজ্য নির্বাচনের জনাদেশকে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনের ফলাফলের ইঙ্গিতবাহী বলে ভাবাটা অজ্ঞতারই নামান্তর। আমরা কয়েকমাস আগেই প্রত্যক্ষ করেছি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে ২০১৮ নভেম্বরে বিজেপি ক্ষমতা হারালেও কয়েকমাসের মধ্যেই এ বছর মে মাসে লোকসভা নির্বাচনে এই তিনটি রাজ্যেই মানুষ বিপুল ভোটে বিজেপিকেই নির্বাচিত করেছে। একই ভাবে ২০১৭ সালে গুজরাট বিধানসভার ক্ষেত্রেও বিজেপির আসন কমলেও লোকসভার ক্ষেত্রে অন্য দলগুলি খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। ওড়িশার নির্বাচন লোকসভার সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে হলেও লোকসভায় বিজেপি যে সাফল্য পেয়েছিল বিধান সভায় আসনসংখ্যা তার অনুপাতে অনেক কম। সেখানে প্রাদেশিক বিজু জনতা দলই চমকপ্রদ সাফল্য বজায় রাখে। আবার দেখুন কর্ণাটকে ভোটদাতারা বিজেপিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয়নি। কংগ্রেস ও জনতা দল (এস)-এর বিষম জোট বেশি দিন টেকেনি সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভায় কর্ণাটকেও বিজেপি তুমুল সাফল্য পায়।

অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে এমনটা কি বলা যায় না যে স্থানীয় বিষয়গুলি যতটা প্রকটভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে গেছে তার অনেকটাই অর্থনীতির নিম্নমুখীর কারণে। যদি সর্বভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রের পরিস্থিতির চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকত তাহলে হরিয়ানার জাঠেরা বা মহারাষ্ট্রের স্থানীয় বিষয়গুলির অভিঘাত হয়তো গ্রামাঞ্চলে বিজেপির ফলাফলকে কম প্রভাবিত করত।

এই উদাহরণগুলি থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় না কি যে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার সাম্প্রতিক ফলাফল সেখানকার স্থানীয় বিষয়ভিত্তিক ছাড়া অন্য কিছু নয়? যেমন মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ মানুষদের সেখানকার বিজেপি নেতৃত্ব সফলভাবে শান্ত করেছিল। কিংবা হরিয়ানায় জাঠদেরও বেশি আন্দোলনমুখী হতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, হরিয়ানা মন্ত্রীসভার ৭ জন মন্ত্রীর

পরাজয়ই প্রমাণ করে সেখানকার স্থানীয় অসন্তোষ কতটা বাড়ছিল।

তাহলে আমি জাতীয় স্তরে অর্থনীতির দশা নিয়ে যে পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলাম এই উদাহরণগুলি সবই তো তাহলে তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। জাতীয় সমস্যাগুলি কি তাহলে রাজ্য নির্বাচনে কোনো রেখাপাতই করেনি? অর্থনীতির নিম্নগতি কি তাহলে আদৌ কোনো সাবধানবাণী দিচ্ছে না?

(১) মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণ ছন্নছাড়া অবস্থায়। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের মতো তারকা প্রচারক ও ভোট বিশেষজ্ঞের জুড়ি একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এমন একটা পরিস্থিতিতেও হরিয়ানায় বিরোধী হিসেবে যে সংখ্যাটা কংগ্রেসের এসেছে স্থানীয় নেতৃত্বকে আরও আগে সক্রিয় করলে পরিণামে হেরফের হলেও হতে পারত। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে প্রচারে খুঁজেই পাওয়া যায়নি।

(২) দু' রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি অর্থনীতির প্রসঙ্গ প্রায় তোলেইনি। এর সঙ্গে জড়িত অনুষঙ্গগুলিও উত্থাপিত হয়নি।

দলের নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জাতীয়তাবাদ ও পূর্ণ কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ওপর সমগ্র গুরুত্ব আরোপ করা। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ যোজনাকে যাতে আরও বেশি কৃষকের সঙ্গে জোড়া যায় সেদিকে নজর দেওয়া। দ্বিতীয়ত, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ বিলোপজনিত কারণে জাতীয় স্তরে যে প্রভাব পড়েছে তার পূর্ণ প্রচার করা।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেআইনি অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত নীতি নিয়ে সরকারের মনোভাব ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এন আর সি) নিয়ে প্রচার। সর্বশেষ যথাযোগ্য কারণে বীর সাভারকরকে ভারতরত্ন দেওয়ার প্রসঙ্গটিও সংযোজিত হয়। এই চতুর্মুখী ফলা যে কোনো বিরোধী পক্ষের মোকাবিলায় নিশ্চিত ভাবে পর্যাপ্ত বলেই মানতে হবে। সেই অনুযায়ী একটি ছাড়া তাও (কেবলমাত্র হরিয়ানার ক্ষেত্রে) সকলেই দলকে সন্দেহাতীতভাবে বড়ো জয়ের দাবিদার বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত বড়ো সাফল্য না পাওয়ার পেছনে একটা কারণ যে অত্যন্ত সন্তর্পণে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সেটা এড়িয়ে গেলে চলবে না।

(৩) সেই সঙ্গোপনে অগ্রসর হওয়ার কারণটি কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিরও স্তিমিত হয়ে পড়া। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়াকে তাই এড়ানো যায়নি।

ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের অর্থনীতির পরিমাণই সবচেয়ে বৃহৎ। হরিয়ানা ছোটো রাজ্য হলেও দেশের মধ্যে বহরে ১৩তম অর্থনীতি। মাথাপিছু আয়ের হিসেবে হরিয়ানা পঞ্চম। দুটি রাজ্যেই ভালো পরিমাণ শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করা মানুষজনও রয়েছেন। অর্থনীতির নিম্নগতি সমস্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ীই শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপরই প্রভাব ফেলেছে। গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের চাহিদায় বড়ো ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র দু'টি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলেই বিজেপির নির্বাচনী ফলাফলে এর প্রতিফলন দেখা গেছে। যে কারণে অর্থনীতির শ্লথ গতির নির্বাচনী ফলাফলের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই বলাটা নেহাতই বীরত্বব্যঞ্জক কাজ ছাড়া কিছু নয়।

(৪) একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে এমনটা কি বলা যায় না যে স্থানীয় বিষয়গুলি যতটা প্রকটভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে গেছে তার অনেকটাই অর্থনীতির নিম্নমুখীর কারণে। যদি সর্বভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রের পরিস্থিতির চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকত তাহলে হরিয়ানার জাঠেরা বা মহারাষ্ট্রের স্থানীয় বিষয়গুলির অভিঘাত হয়তো গ্রামাঞ্চলে বিজেপির ফলাফলকে কম প্রভাবিত করত।

(৫) পরিশেষে বলা যায়, পূর্বাভাস না মেলার আশা করলেও জিডিপি-তে ৫ শতাংশ বৃদ্ধির আগাম ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে সেটাই আমাদের লক্ষ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ২০২০ অর্থনৈতিক বর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান এখনও আসেনি। তবুও অর্থনীতির হিসেবে গড়ে বছরে ৮ শতাংশ টানা বৃদ্ধি ধরে রাখতে পারলে তবেই সামগ্রিক সমৃদ্ধিকে ছোঁয়া যাবে। না হলে ৫ শতাংশ বৃদ্ধির পড়ার সম্ভাবনা। এর প্রভাব নির্বাচনী ফলাফলে কোনো না সময়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। হরিয়ানা মহারাষ্ট্রের ফলাফল দলকে অর্থনীতি নিয়ে ভাবতে বলছে। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রাজ্যের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যপরিষেবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী

স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং বিশেষ করে চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যাপারে ভারতবর্ষের অন্য অধিকাংশ রাজ্যের থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির গোড়ার দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গ বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় রাজনীতিতে মহীরুহ ছিলেন। চিকিৎসক পরিচয়েও তাই, কিন্তু এই অগ্রণী ভূমিকার প্রধান কারণ বিধানচন্দ্রই ছিলেন— তেমনটাও কিন্তু নয়। রাজধানী কলকাতার মেডিক্যাল কলেজসমূহ এবং সংলগ্ন হাসপাতালগুলোর পরিষেবা ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। কলকাতার বাইরে মফস্‌সল শহরে বা পল্লীগ্রামে অবশ্য চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বিভিন্ন স্থানে হাতে গোনা ডিগ্রিধারী এমবি বা ডিপ্লোমাধারী এলএমএফ ডাক্তারের দেখা মিললেও রোগীদের সহায় ছিলেন কোয়াক চিকিৎসক— হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি ডাক্তাররা। তখন অবশ্য বিদ্যাঙ্গনের শিক্ষকদের মতো চিকিৎসকরাও তাঁদের বৃত্তিকে এখনকার মতো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন না এবং গৃহ চিকিৎসক ব্যাপারটা চালু ছিল—তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের তুলনায় গত শতকের পঞ্চাশ–ষাট দশকে ব্যবস্থা অনেকটাই পিছিয়ে থাকলেও রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা এখনকার মতো অসহায় বোধ করতেন না। তার বড় কারণগুলোর মধ্যে আরও দুটো বিষয় ছিল—চিকিৎসায় ব্যবসা এবং রাজনীতির অনুপস্থিতি।

রাজ্য প্রশাসনের চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভায় দক্ষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার নেতৃত্বে। স্মৃতির পাতা ওল্টালে নজরে আসতে পারে এই সৎ, দক্ষ রাজনীতিক, হাইকোর্টের ব্যারিস্টার এবং সফল প্রশাসক অজিত পাঁজার হাত ধরেই মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় মমতার কৃতকর্মের ফলেই এই দক্ষ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যমন্ত্রী প্রয়াণকালে কলকাতা কর্পোরেশনের সামান্য কাউন্সিলর ছিলেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার পরিমণ্ডলটা এতদিন ছিল 'মোটামুটি' পর্যায়ের। ব্যাপারটা 'মন্দ' হতে শুরু করল বামফ্রন্ট যখন সমাজ ও শাসনব্যবস্থার সব কিছুই রাজনীতির জালে তুলতে শুরু করল। শ্রমিক, শিক্ষক, নিম্নবর্গের সরকারি কর্মচারিরা কংগ্রেস আমলেই নানা দাগের বামপন্থী ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা এতদিন পুরোপুরি রাজনীতির আবহের বাইরে ছিলেন, কারণ জীবনমরণের কান্ডারি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে রোগীর সম্পর্কটা এমনই যে তার ফাঁকে লাল নাকটা গলানো যাচ্ছিল না। সিদ্ধার্থশঙ্করের আমলেই সরকারি ডাক্তাররা এমন একটি সংগঠন গড়েছিলেন যার অন্যতম নীতিই ছিল রাজনীতির ছোঁয়া এড়িয়ে চলা। সরকারি অপদার্থতা, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা জনসাধারণের সেবায় প্রকৃষ্টরূপে নিয়োজিত ছিল না। এর প্রতিকারের জন্যই ছিল ডাক্তারদের এই সংগঠন। সদস্যদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যটা মুখ্য ছিল না। সিদ্ধার্থশঙ্করের সরকার এই সংগঠনের দুই বেয়াড়া নেতাকে বরখাস্তও করে। তখন বামপন্থীরা সংগঠনের দাবি দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং ক্ষমতায় এসে এই দুই ডাক্তারকে চাকরিতে পুনর্বহালও করে।

পশ্চিমবঙ্গের আজকের রাজনীতির কঙ্কালসার অবস্থান প্রমাণ দিতে আদি অরাজনৈতিক সংগঠনটি প্রায় সদস্যহীন অবস্থায় কোনওরকমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ফলে রোগী তাঁদের পরিজনবর্গ এবং জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছে যে সরকারি ডাক্তাররা অসুখ বিসুখ বা ওষুধপত্তরের থেকে দলীয় রাজনীতির চর্চাই বেশি করছেন।

কিন্তু গোটা সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকেই তো বামপন্থীরা তাদের চেতনায় জারিত করতে বদ্ধপরিকর তাই ডাক্তারদের বেয়াদবি তাদের সহ্য করার কথা নয়। একের পর এক ডাক্তার ও জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্মঘটে ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে সিপিএম সরকারি ডাক্তারদের একটি লাল ধামার নীচে আনার প্রচেষ্টা শুরু করল সংগঠনটিকে ভাঙার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সংগঠনের সভাপতি স্বয়ং ছিলেন লালজামাপরা, সঙ্গীসাথিও জুটতে লাগল। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ২৪ জুন তারিখে মৌলালি যুবকেন্দ্রে এরাজ্যের ও ত্রিপুরার দুই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও নৃপেন চক্রবর্তীর মতো নেতাদের চাঁদের হাটে প্রতিষ্ঠিত হলো অনুগত সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন। স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমে অরাজনৈতিক সংগঠনটি সদস্য সংখ্যার নিরিখে পিছিয়ে পড়তে থাকল। সর্বগ্রাসী বামপন্থীরা কিন্তু এখানেই থেমে থাকল না। ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যপরিষেবা বিধিকে অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক ভাবে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংশোধন করে বেয়াড়া ডাক্তারদের পথে আনার ব্যবস্থা করা হলো। ডাক্তাররা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়োদৌড়ি করেও পেরে উঠলেন না—উন্নতশির কয়েকজন চাকরি ছাড়লেন, নাচার বাকিরা লাল জাল মারফত রক্তিম খালুইতে স্থান পেলেন। সেই যে সরকারি

ডাক্তারদের রাজনীতির মাঠে লাল জার্সি গায়ে খেলতে নামানো হলো এবং কোচিং করানোর জন্য বেশ কয়েকজন সিনিয়র ডাক্তারকেও পাওয়া গেল---তার বিষময় ফল আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নন্দীগ্রাম কাণ্ডের বহু আলোচিত আখরোজা বিবির নাম অনেকেরই মনে আছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনেই বলা হয়েছিল তাঁকে এবং তাঁর সামনেই সিপিএম ক্যাডাররা তাঁর দুই কন্যাকেও বলাৎকার করে, কিন্তু সরকারি ডাক্তাররাই কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে সাক্ষ্যে বলেছেন (১) হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার ছিল না বলে যোনিরস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি এবং অবিশ্বাস্য হলেও (২) বিবাহিতা ও সন্তানের জননী ধর্ষিতা হলেও বোঝা যায় না। নারীত্ব এবং মানবিকতার এত বড় অপমান সম্ভব হয়েছিল ডাক্তারদের রাজনীতিকরণের জন্যই।

বিরোধী নেত্রীর অবস্থানে এবং মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম দিকে মমতা ব্যানার্জি সরকারি ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্যদপ্তরের রাজনীতি নিয়ে গালভরা কথা বলতেন। আসরে নেমেই তিনি দলবল ও সাংবাদিক নিয়ে হাসপাতাল পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। তখন তাঁর ডাকসাইটে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিনা অপরাধে বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ শ্যামাপদ গড়াইকে সাসপেন্ড করা এবং দক্ষ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অরুণ সিংহকে রাজ্য ছাড়া করা। তেড়েফুঁড়ে শুরু করে পরবর্তীকালে তিনি প্রশাসনের সর্বত্রই তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির রং লাগাতে শুরু করলেন। তাঁর দ্বিতীয় দফার শাসনকালে আরেকটি মহান কৃতিত্ব হলো রোগীর মৃত্যুর কারণ 'ডেঙ্গি' বলে উল্লেখ করার অপরাধে ডাঃ অরুণাচল দত্ত চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা। ডাঃ গড়াই ঝুলন্ত অবস্থাতেই অবসরসীমা পেরিয়েছেন, ডাঃ দত্তচৌধুরিও তার কাছাকাছি চলে এসেছেন।

ইতিমধ্যে এই দপ্তরে তিনি যে কটি কাণ্ড ঘটিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো রাজ্যজুড়ে গোটা চল্লিশেক হাসপাতাল প্রাসাদ তৈরি করা নামকরণে multisuperspeciality hospital বটে, কিন্তু সেখানে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী বাড়ন্ত, কিছুদিন আগেই প্রচারিত একটি সংবাদে জানা গেল এমন একটি হাসপতাল থেকেই এক সাধারণ প্রসূতিকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। তেমনই এখন রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সতেরো কিন্তু সেখানেও শিক্ষকদের দেখা মেলা ভার। সল্টলেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের ঝাঁ চকচকে অফিস আছে কিন্তু পরিচিত এক সরকারি ডাক্তারকে দফতরের মন্ত্রীর নাম জিগ্যেস করায় কৌতুকের ঢঙে উত্তর পেলাম—'স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই'। আছেন এক প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কিন্তু টেলিভিশন-বিতর্ক, সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই অফিসের সামনে ধরনা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকায় দপ্তরের কক্ষ এবং কাঠি নাড়ানাড়ির কাজটা করেন দুই ডাক্তারি ডিগ্রিধারী জনপ্রতিনিধি বিধায়ক নির্মল মাজি এবং সাংসদ শান্তনু সেন—স্বাস্থ্যসচিব, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাদ্বয় বোধহয় সইটই করেন। আর রাজনীতির চালচিত্রটা বেশ রংবেরঙের। শতকরা ষাটভাগ চিকিৎসকই এখন শাসক দলের ঝান্ডার নীচে হুড়োহুড়ি করছেন। সিপিএমের সংগঠনটির এখন হাড়জিরজিরে অবস্থা সদস্য সংখ্যা ৩০/৩৫ জন। অরও দু'একটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠন গড়ে উঠেছে—এক সরকারি ডাক্তার তো সরকারি চাকরিরত অবস্থাতেই গত লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গের আজকের রাজনীতির কঙ্কালসার অবস্থান প্রমাণ দিতে আদি অরাজনৈতিক সংগঠনটি প্রায় সদস্যহীন অবস্থায় কোনওরকমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ফলে রোগী তাঁদের পরিজনবর্গ এবং জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করছে যে সরকারি ডাক্তাররা অসুখ বিসুখ বা ওষুধপত্তরের থেকে দলীয় রাজনীতির চর্চাই বেশি করছেন।

এ তো গেল অতীত ও বর্তমানের কাহিনি। এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে হবে সরকারি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল সাধারণের পরিত্রাণের উপায় কী?

কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে একটি ছোটখাটো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং স্বল্পমেয়াদে বেঁধে দেওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্বাস্থ্যকমিশন নিয়োগ করে। কমিশনের প্রধান সদস্যগণ হবেন অবশ্যই আধুনিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য এবং ঔষধ বিজ্ঞানের বরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ—সঙ্গে এই বিষয়ে চর্চারত সুশীল সমাজের দু'একজন বিশিষ্টকেও রাখা যেতে পারে। তবে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি প্রভৃতি দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিনিধিদেরও সদস্যদলে রাখতে হবে। কারণ এদেশে এবং বিশেষ করে এরাজ্যে আধুনিক চিকিৎসকগণ এঁদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চান না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের আলমা আটা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ঐতিহাসিক সুপারিশ ছিল পৃথিবীর সব দেশ যেন নিজ নিজ দেশজ পদ্ধতির বিকাশ ও বিস্তারের ব্যবস্থা করে। এই পরামর্শ গ্রহণ করে সর্বাধিক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছে চীন এবং সেদেশে ছোটবড় সব চিকিৎসালয়েই দেশজ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে আধুনিক পদ্ধতির পাশাপাশি এবং এতে যে কাজটা হয়েছে সেটা হলো সাধারণ রোগীদের দেশজ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে পারলে হাসপাতালের চাপ অনেকটা লাঘব হয় এবং আধুনিক পদ্ধতির ডাক্তাররা অধিকতর মনযোগ সহকারে কঠিন রোগের চিকিৎসা করার সুযোগ পান। ভারত সরকারও এই পরামর্শ গ্রহণ করে সব রাজ্যকেই আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় যে সমস্যাটির প্রতি সরকারের বিশেষ নজর দিতে হবে তা হল পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সুচিন্তিত প্রতিনিধি সংবলিত শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। এটির সদস্যমণ্ডলীতে ছিলেন সারা ভারতের তেরোজন বিশেষজ্ঞ (এরাজ্যের দুজন বিশিষ্ট রাজনীতিক ডাক্তারসহ), আরও তিনজন আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ এবং নয়াদিল্লির এইমসের সেন্টার ফর কমিউনিটি মেডিসিন ছিল সাহায্যকারী সংস্থা। গ্রামাঞ্চলের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তার সুপারিশ এই টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনের একটি প্রধান অংশ ছিল। কারণ, প্রথমত, এমবিবিএস ডাক্তারদের দিয়ে এত বড় দেশের রোগীদের সুশ্রুষা সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়ত, আধুনিক মেডিক্যাল কলেজে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ট্রেনিং নিয়ে এমবিবিএস-রা গ্রামেগঞ্জে নানা অভাব অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে অস্বস্তিবোধ করেন এবং সরকারি চাকরি নিতে রাজি হন না। আগেকার LMF ডিপ্লোমা ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কিন্তু সেই ডাক্তাররা অধীত বিদ্যার বাইরে গিয়েও চিকিৎসা করায় সমস্যা হয় এবং ১৯৬৪ সালে প্রথাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। টাস্ক ফোর্স তাই পরামর্শ দিয়েছিল চিকিৎসার সীমারেখাও নির্দিষ্ট করার জন্য। এই পরামর্শ গ্রহণ করে কয়েকটি রাজ্য স্বল্পমেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করে উপকৃতও হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে The West Bengal Rural Health Regulatory Authority Act, ২০০৯ পাশ করিয়েছিল, কিন্তু পরে পিছিয়ে আসে। তাছাড়া বামফ্রন্ট পল্লীগ্রামের কয়েকশো পাশকরা চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগও করেছিল। স্বাস্থ্য কমিশনকে বলা যেতে পারে এই প্রকল্প দুটিকে পর্যালোচনা করে যথাযথ সুপারিশ করতে।■

জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায় তাঁর সাহসী 'পরিবার'-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দীপাবলী উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখায় কর্মরত সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলী উদ্‌যাপন করলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী এবার নিয়ে তৃতীয় বছরেও তাঁর এই পরম্পরা বজায় রাখলেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজৌরির 'হল অব ফেম' পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে রাজৌরি এবং পুঞ্চ সেক্টর রক্ষায় যেসব সৈনিক এবং নাগরিক প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি 'হল অব ফেম'কে 'পরাক্রম ভূমি, প্রেরণা ভূমি, পবিত্র ভূমি' বলে বর্ণনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এরপর ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান যোদ্ধাদের সঙ্গে পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে সাক্ষাৎ করেন। সেনাবাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকে বহুদূরে গিয়ে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দীপাবলী উৎসব পালন করে। তাঁদের মতো তিনিও তাঁর পরিবারের সদস্য-সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে এই উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য এখানে এসছেন। প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবর সেনাবাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করেন। এই দিনটিকে পদাতিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাহসিকতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, তাঁদের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার এখন অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, যা এক সময় অসম্ভব বলে মনে করা হতো। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সেনাবাহিনীর সাহসিকতার দিকটি উল্লেখ করেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদের জাতির প্রতি এই সেবার জন্য ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সরকার রাজধানীতে জাতীয় যুদ্ধ স্মারক গড়ে তুলেছে। এই যুদ্ধ স্মারকে দর্শকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে জনগণের সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং এর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। সৈনিকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার দায়বদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে শরদ অরবিন্দ বোবদে'কে নিযুক্ত করেছেন। বিচারপতি বোবদে আগামী ১৮ নভেম্বর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তিনি ২০১৩'র ১২ এপ্রিল থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এর আগে তিনি প্রায় ছয় মাস মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও, তিনি বোম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে কাজ করেছেন। বিচারপতি বোবদে নাগপুর জেলা আদালত এবং বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বোম্বে হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টেও তিনি সিভিল, সাংবিধানিক, শ্রম, কোম্পানি, নির্বাচন এবং কর সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ বিশেষ সময় সওয়াল-জবাব করেছেন। সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, কোম্পানি, পরিবেশগত এবং নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগুলির ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এই প্রথম কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব'। আগামী ৫-৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। বিজ্ঞানকে শুধু গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ করে রাখা নয়, তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বাস্তব জীবনের কীভাবে প্রতিফলন ঘটানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই পঞ্চম ভারত বিজ্ঞান উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর ও বিজ্ঞান ভারতীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব চলবে চারদিন। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার, সায়েন্স সিটি, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট (এস আর এফটি আই), বোস ইন্সটিটিউট এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি কেন্দ্রে বসবে এই বিজ্ঞান উৎসবের আসর। দেশ ও বিদেশের প্রায় ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে যোগ দেবে।

আসন্ন ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের প্রচারকে জোরদার করে তুলতে কলকাতায় আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তরের অন্তর্গত ন্যাশনাল

অ্যাটলাস অ্যান্ড থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন (ন্যাটমো)-র উদ্যোগে প্রচারমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার অধিকর্তা শ্রীমতী তপতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই উৎসবে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিজ্ঞানী, গবেষকরাও যোগ দেবেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক ২৮টি বিষয় এই উৎসবে তুলে ধরা হবে। এবারের উৎসবে এই প্রথম দিব্যাঙ্গদের সুবিধার্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কৃত্রিম মেধাসত্তা বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো, ডিআরডিও, ডিএই সহ বিভিন্ন সংস্থা তাদের গবেষণার বিষয় এবং বিভিন্ন মডেল এই উৎসবে তুলে ধরবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ভারতীর জাতীয় সম্পাদক জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে।

কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ দপ্তরের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের জন্য ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়নের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ দপ্তরের আধিকারিকরা শীঘ্রই শ্রীনগর সফর করতে পারেন বলে বিভাগীয় মন্ত্রী ড. জীতেন্দ্র সিংহ জানিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শ্রী ভি শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল গত ৪-৫ সেপ্টেম্বর জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যায়। এছাড়াও শ্রী শেখরের নেতৃত্বে আরও একটি দল গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর সফর করে। শ্রী শেখরের নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাওয়া তৃতীয় প্রতিনিধিদলটি গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি দপ্তরগুলিতে ই-কার্যালয় কর্মসূচি রূপায়ণ, আধিকারিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী কে কে শর্মার তত্ত্বাবধানে গত ১৬ অক্টোবর আয়োজিত এক জন অভিযোগ শুনানী কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা শোনেন এবং সমস্যা নিরসনের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে আধিকারিকদের অবহিত করেন। এই প্রতিনিধি দলটি জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারকে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার কর্মসূচির আওতায় যে ১১টি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে বিশদে সাফল্যের কাহিনি প্রকাশ করার অনুরোধ জানান। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো, ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও দক্ষ করে তোলা। এরপর এই প্রতিনিধি দলটি রাজ্যপালের দুই উপদেষ্টার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা ও উন্নয়ন তথা শিল্প ও সংস্কৃতি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও জম্মু ও কাশ্মীরে প্রশাসনিক সংস্কার ও জন অভিযোগ দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জম্মু ও কাশ্মীরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তথা ঐতিহ্য নিয়ে স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র বা ভিডিয়ো প্রযোজনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে জম্মুতে আগামী ৩০ নভেম্বর বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুদিনের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

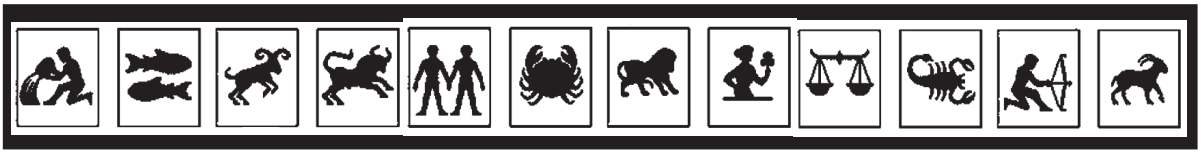

৪ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ১০ নভেম্বরবর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, কন্যায় মঙ্গল, তুলায় রবি বৃশ্চিকে বক্রী বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ধনুতে শনি কেতু। পুনরায় ৬-১১ বুধবার, দুপুর ১টা ২ মিনিটে বক্রী বুধের তুলায় প্রত্যাবর্তন এবং ৫-১১ মঙ্গলবার, ভোর ৩টে ২৪ মিনিটে বৃহস্পতির ধনুতে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে শ্রবণা নক্ষত্র থেকে মীনে রেবতী নক্ষত্রে।

মেষ : গুরুজনের কারণে মনঃক্লেশ, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় এবং কর্মক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে অনুতাপ। বিদ্যার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণায় বাধা, শরীরের নজরদারি ও উত্তেজনাকর পরিবেশে শান্ত ও সংযত থাকুন। রাজনীতিকদের নতুন দিশা। স্ত্রীর হঠকারী সিদ্ধান্তে ব্যয় বাহুল্য।

বৃষ : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অপ্রত্যাশিত ব্যয়, সন্তানের কারণে পারিপার্শ্বিক হতাশার পরিবেশ, গোপন তথ্য প্রকাশে বিড়ম্বনা, ক্রনিক রোগীদের সুচিকিৎসায় বিলম্ব। অনৈতিক উপায়ের লোভনীয় হাতছানি পরিহার করুন। সপ্তাহের প্রান্তভাগে কর্মক্ষেত্রে উত্তেজনা, সমালোচনা, খেসারত, সম্মানহানি।

মিথুন : জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ন, অলংকার ও গৃহ সরঞ্জাম বৃদ্ধি। নতুন নির্মাণ ও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় কৃতিত্ব। স্ত্রীর নতুন কর্ম ও পদোন্নতির যোগ। স্বীয় প্রতিভায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব।

কর্কট : মানসম্মান, সখ্য, বিচক্ষণতা, উদারতা, সরলতা, সমাজ প্রগতিমূলক কাজে প্রত্যয়দীপ্ত পথচলা। কর্মদক্ষতার বৈচিত্র্য ও অভিনব প্রয়াসে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। সন্তানের কারণে প্রতিবেশীর বৈরিতা, ভ্রাতা-ভগ্নীর সমালোচনা। বিদ্যার্থীদের সাফল্যে পরীশ্রম ও অধ্যাবসায় প্রয়োজন।

সিংহ : শারীরিক অসুস্থতায় জেরবার, তবে পরিবারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কারিগরি কুশলতা ও সৃজনশীলতায় সম্ভ্রম, সামাজিক কার্যকলাপে বহুমুখী প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ, বিত্ত, সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। দৈব দুর্ঘটনা, আইনি ঝামেলা হতোদ্যমের কারণ।

কন্যা : কর্ম সংক্রান্ত পরীক্ষার্থী, ফ্যাশন ডিজাইনার, ভাস্কর্য ও নৃত্যশিল্পী, সমাজসেবী, শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক, নাট্যব্যক্তিত্বদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বহুমুখী কর্মপ্রয়াস, প্রতিভার ব্যাপ্তি, শংসা ও প্রতিষ্ঠা। হাঁপানি, বাত ও নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। ব্যবসায় ঋণবৃদ্ধি অথবা মন্দাভাব দেখা দেবে।

তুলা : আগ্রহের পদোন্নতি, নিকট প্রতিবেশীর সহযোগিতা, উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বিদেশ যাত্রা, গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টিতে বৈষয়িক উন্নতি। ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে ধনার্জন ক্ষমতার প্রসার ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। বিজাতীয় রমণী সান্নিধ্যে সময় ও অর্থের অপচয়।

বৃশ্চিক : ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক ঝামেলা। গৃহের প্রতিকূল পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ। মহিলার শত্রুসম উপদ্রব, পুরানো সম্পত্তি বিক্রয়ে অর্থাগম। বিচ্ছেদ হওয়া বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন, কর্মস্থানে মনঃসংযোগের অভাব। বাক্যালাপে সতর্কতা প্রয়োজন, ভ্রাতৃ বিরোধ ও ব্যয়াধিক্যে শান্ত-সংযত থাকুন।

ধনু : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রতাপ, চিন্তার স্বচ্ছতা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে উদার হৃদয়ের বিকাশ। সন্তানের দৃঢ় প্রত্যয় ও যোগ্যতার মেলবন্ধনে আত্মপ্রতিষ্ঠা। স্ত্রীর জেদ ও অমিতব্যয়িতায় মানসিক চাপ ও বিভ্রান্তি। গুরুজন ও প্রতিবেশীর বিরাগভাজন।

মকর : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অসহযোগিতা, মানসিক চাপ, পরিচিত সুহৃদ দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা শ্রেয়। ভ্রাতা ও ভগ্নীর উন্নতিতে আনন্দ। ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রগতি। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি, স্বজন সমাবেশে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

কুম্ভ : আয়ের শ্লথ গতি, অসুস্থতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া, হতোদ্যমের কারণ। পুরাতন আবাস বিক্রয়, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নির্বিকার চিত্তে বিজয়ীর সম্মান। সন্তান- সন্ততির সাফল্য ও প্রতিষ্ঠায় আনন্দ, গর্ব। সাংবাদিকতায় জনপ্রিয়তা ও শংসা।

মীন : উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, স্বজন সম্পর্কে সদ্ভাব। প্রভাব প্রতিপত্তি, জনহিতকর কাজে সাফল্য। নিজ প্রতিভার বাস্তবায়ন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপার্জনে স্বাচ্ছন্দ্য, সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। ব্যবসায় বিনিয়োগে আশাপূরণ, সন্তান-সন্ততির যোগ। সপ্তাহের শেষভাগে অম্ল, অজীর্ণ ও শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য